বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের রূপায়ণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্যে লেখা গবেষনা অভিসন্দর্ভ

সোহেলী নার্গিস

বাংলা বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা

ডিসেম্বর ১৯৯৯ ইং

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে সোহেলী নার্গিস এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ "বাংলাদেশের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের রূপায়ণ" অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রীর জন্যে উপস্থাপিত হয়নি এবং এ অভিসন্দর্ভের কোনো অংশও কোথাও, প্রকাশিত হয়নি।

রফিকুল ইসলাম ২০.১২.৯৯

ডঃ রফিকুল ইসলাম
গবেষনা তত্ত্বাবধায়ক,
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা

382704

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা পৃ- ৩

প্রথম অধ্যায় পৃ-৬-২৪
- আনোয়ার পাশার মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস পৃ- ৭
- শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস পৃ- ১০
- রিজিয়া রহমানের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস পৃ- ১৬
- সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস পৃ- ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায় পৃ-২৫-৪০
- আমজাদ হোসেনের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস পৃ- ২৬
- সেলিনা হোসেনের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস পৃ- ৩২
- রশীদ হায়দারের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস পৃ- ৩৭

তৃতীয় অধ্যায় পৃ- ৪১-৬১
- হুমায়ুন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস পৃ- ৪২
- ইমদাদুল হক মিলনের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস পৃ- ৫২
- মইনুল আহসান সাবেরের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস পৃ- ৫৬
- শিরীন মজিদের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস পৃ- ৬০

চতুর্থ অধ্যায় পৃ-৬২-৭৬
- মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস পৃ- ৬৩

উপসংহার পৃ- ৭৪

গ্রন্থপঞ্জি পৃ- ৭৬

382704

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

উপন্যাস হচ্ছে আধুনিকতম এবং সমগ্রতাস্পর্শী সেই শিল্প প্রতিমা যেখানে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় জীবনের আদি, অন্ত্য, লেখকের জীবনার্থ এবং তাঁর স্বদেশ ও সমকাল। উপন্যাস উদ্ভবের কারণ নিহিত রয়েছে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার বৃহদায়তন, জটিল ও সঘর্ষতাড়িত জীবনাবর্তের শিল্পরূপ সন্ধানের মধ্যেই। অবক্ষয়িত সামন্ত সমাজকে কেটে দিয়ে ষোল-সতের শতকে ইউরূপে নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তির উদ্ভবের সাথে সাথে আবির্ভাব ঘটলো উপন্যাসের। উনিশ শতকের প্রারম্ভেই কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটে। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এ নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে রচিত হয় বাংলা উপন্যাস শিল্প। আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক কারণে পূর্ববঙ্গের মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হয়েছে শতবর্ষ বিলম্বিত।

ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় উনিশ শতকের নবজাগ্রত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেরূপ সহজভাবে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল, বাঙ্গালী মুসলমানদের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর বিপর্যয়কে নিজেদের বিপর্যয় বলে মনে করেছিল।ফলে, কিছুটা অভিমান ও অসহযোগ তাদেরকে নিক্ষেপ করলো অতীতচারিতায়। এ অবস্থা অতিক্রম করতে বাঙ্গালী মুসলমানকে অপেক্ষা করতে হলো বিশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর উদ্ভব দ্বিধান্বিত বাঙ্গালী মুসলমানকে আধুনিক জীবন চেতনার প্রতি আকৃষ্ট করতে অনেকাংশে সক্ষম হয়েছিল। এই পরিবর্তিত সময় ও সমাজের প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছিল বাংলাদেশের বাংলা উপন্যাসের ভিত্তিমূল।

ঐতিহাসিক নিয়তিই অথবা ঔপনিবেশিক শাসনের নতুন রূপের জন্যেই হোক, ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি বাঙ্গালীর শিল্প চর্চাকে সীমিত সময়ের জন্য হলেও দ্বিধান্বিত করেছিল। পূর্ব বাংলা একটা স্বাধীন ও স্বায়ত্ব শাসিত ভূখন্ড হিসাবে গড়ে উঠার পরিবর্তে রূপান্তরিত হলো আধা উপনিবেশিক ও আধা-সামন্তবাদী অঞ্চল হিসেবে। ব্রিটিশ শাসিত পূর্ববাংলা প্রাকান্তরে পরিণত হলো পাকিস্তান শাসিত পূর্ববঙ্গে। এর ফলে বুর্জোয়া মানবতাবাদে আস্থাশীল শিল্পচৈতন্যে দেখা দিল সংকট। প্রাক-সাতচল্লিশ পর্বে গ্রামীন সংগ্রামশীল মানুষ এবং নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্তের অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎকে ধারণ করেই পূর্ব-বাংলার উপন্যাসের অভিযাত্রা। এ-পর্বের উপন্যাস-সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে সামন্ত-মূল্যবোধসমূহ, তবু মানবতাবাদী চেতনার শিল্পরূপ অংকনের প্রয়াস এ পর্বে, সীমিত হলেও,একেবারে উপেক্ষিত নয়। বিভাগ-পূর্ব কালের উপন্যাস প্রধানত গ্রাম্য জীবন কেন্দ্রিক; তবে কখনো সেখানে এসেছে বিকাশমান নগর জীবনের খন্ডিত ছবি। প্রাক-সাতচল্লিশ পর্বের এই উত্তরাধিকারের ওপরেই নির্মিত হয়েছে বিভাগোত্তর কালের উপন্যাস সাহিত্য।

বায়ান্নর রক্তাক্ত উজ্জীবন ঔপন্যাসিকের মধ্যে যে স্বপ্ন এবং সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করলো, চেতনার সেই গতি ব্যাহত হলো ১৯৫৮ সালে। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের আগ্রাসন শিল্পী চৈতন্যে সঞ্চার হলো প্রতিবাদী মনোভঙ্গি। অবশ্য ব্যতিক্রম যে একবারেই ছিল না তা নয়। কিন্তু শিল্পের উত্তরণ তো কেবল বিষয় কেন্দ্রিক নয়, প্রকরণ নির্ভর ও । প্রথম পর্বের ঔপন্যাসিকরা যেখানে সত্য অন্বেষায় জীবনকেন্দ্রিক, দ্বিতীয় পর্বের ঔপন্যাসিকেরা সেখানে আত্ম-পরায়ণ ও বিবর সন্ধানী। এর ফলে প্রথম পর্বে ঔপন্যাসিকদের মধ্যেও সংগঠিত হলো অভাবিত বিবর্তন। ১৯৫৮ সাল থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের উপন্যাসের গতি যেমন বিচিত্রমুখী, তেমনি সংখ্যার দিক থেকেও আশাব্যঞ্জক। এ পর্যায়ের ঔপন্যাসিকেরা শুধু বিষয় নয়, জীবনদৃষ্টির ক্ষেত্রে এবং ভাষা ও গঠনরীতির পরীক্ষা নিরীক্ষায় ও অবতীর্ণ হলেন। ষাটের দশক থেকে আমাদের উপন্যাস গভীরতা পেতে থাকে নানান দিক থেকে। বাংলা উপন্যাসের এই মুক্তির কতোগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ ছিলো। প্রথমতঃ বাহান্নর আন্দোলনের পর বেশ কিছু তরুন উপন্যাসিকের আবির্ভব ঘটে, তাঁরা জীবন ও আধুনিক চেতনার নানা বিকাশকে করায়ত্ত করার চেষ্টা করেন। ভাষা আন্দোলনের সময়ে যারা তরুণ ছিলেন, ষাটের দশকে তারা সবদিক থেকেই পরিণত হচ্ছিলেন। পাকিস্তানের মোহ তাঁদের অবশিষ্ট ছিলো বলে মনে হয় না,বরং পাকিস্তানে যে মধ্যযুগীয় চেতনাক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছিলো, তাঁদের বিদ্রোহ ছিলো তার বিরুদ্ধেই। ফলে তাঁদের উপন্যাসের বিষয় এবং শিল্পরীতিতে একটা নতুনত্ব পাওয়া গেলো, আধুনিকতা অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক চেতনা যার উৎস।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়ত, উপন্যাসের এতোকাল পর্যন্ত ব্যবহৃত গ্রামীণ জীবনের বদলে নগর জীবন ও নাগরিক সমাজের পটভূমি স্থান পেতে থাকলো। সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা গেলো উপন্যাসের কেন্দ্র বিন্দুতে আসছে ব্যক্তি।

ষাটের দশকে নতুন জীবন,চেতনা এবং প্রকাশ রীতি নিয়ে যারা উপন্যাস লিখলেন তাঁদের উপন্যাসে এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনা, আশা, কল্পনা, ব্যর্থতা এবং সংকট রূপায়িত হলো। এতোকাল দীর্ঘ গ্রাম পরিক্রমনে যে উপন্যাস ক্লান্ত, বিবর্ন এবং নিঃস্বাদ হয়ে উঠছিলো- ষাটের দশকে নতুন ঔপন্যাসিক গোষ্ঠীর হাতে নানা অর্থে তার পুর্ন জন্ম হলো।

একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে চৈতন্যের ক্ষেত্রে যে অভিঘাতের সূচনা করলো স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের উপন্যাসে তার প্রতিফলন স্বভাবিকভাবেই প্রত্যাশা ছিলো। জীবন বিন্যাসের সামগ্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে শিল্পীর একাত্মতার প্রশ্নটি এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ। যে ব্যাপক আত্মত্যাগ রক্তক্ষয় এবং সংগ্রামের মধ্যদিয়ে বাঙ্গালী স্বাধীনতার সূর্য সম্ভাবনাকে আহরণ করলো, স্বাধীনতা-উত্তর এক দশকের উপন্যাসে তার প্রতিফলন হতাশা-ব্যঞ্জক। মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকদের আলোড়িত করেছে সত্য, তাদের বিষয় নির্বাচনেও সঞ্চার করেছে নতুনত্ব। কিন্তু জীবনের যে পরিবর্তন পরম্পরা ও সমগ্রতার অঙ্গীকারে বিষয় ও প্রকরণে উত্তরণ ঘটলো সম্ভব অধিকাংশ লেখকের মধ্যেই তা অনুপস্থিত। তবু জীবনের এই জাগরণ যে শিল্পীর অঙ্গীকারবোধ ও জীবনচেতনার ক্ষেত্রে আগ্রহের সঞ্চার করেছে তার গুরুত্ব কম নয়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক সংগঠনে পরিমানগত পরিবর্তনের সাথে চেতনার ক্ষেত্রেও ঘটেছে গুনগত বিকাশ। স্বাধীনতার সোনালী প্রভায় আমাদের মন আর মননে যে নতুন চেতনা জাগ্রত হয়েছে, উপন্যাসে তার প্রতিফলন ছিল একান্তই প্রত্যাশিত। এ পর্বের উপন্যাসে আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে জড়িয়ে আছে সংগ্রাম ও বিজয়ের অবিমিশ্র অভিব্যক্তি, যা একান্তই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের উত্তরাধিকার। যুদ্ধোত্তর সময়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়, সর্বব্যাপী হতাশা, নৈরাজ্য এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে মহৎ শিল্পীমানস অনুসন্ধান করে জীবন ও শিল্পের জন্য সদর্থক এবং আলোকোজ্জ্বল এক মানস ভূমি, কোন কোন ঔপন্যাসিকের রচনায় এ জাতীয় অভিজ্ঞা মুক্তিযুদ্ধোত্তর উপন্যাস-সাহিত্যের আশাব্যঞ্জক দিক।

সমসাময়িক সমাজ জীবনের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক যত নিবিড়,অন্য কোনও শিল্প-আঙ্গিকের সম্পর্ক ততটা নয়। বিভাগপূর্ব এবং বিভাগোত্তর কালের কয়েক দশকের মধ্যে এবং স্বাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে, বাংলাদেশের উপন্যাসে স্বাভাবিক ভাবে তার ছাপ পড়েছে। একদিকে কৃষিভিত্তিক পল্লী জীবন অপরদিকে আধুনিক দ্বন্ধে পরিপূর্ণ নাগরিক জীবন; একদিকে বাংলাদেশের ঐশ্বর্যময় বহিঃ প্রকৃতির বর্ণনা,অপরদিকে আধুনিক মানুষের জটিল অন্তর প্রকৃতির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ; একদিকে প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষন, অপরদিকে রোমান্টিক কল্পনার বিলাস, একদিকে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিক্ষুব্ধ পটভূমিকায় মানুষের অস্থিরতা,অপরদিকে হৃদয়াবেগের চিরন্তন পটে প্রতিষ্ঠিত প্রেমিক মানুষ,সবই আমাদের বাংলা উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে।

সৃষ্টিধর্মী লেখকরা তাঁদের রাজনৈতিক উপলব্দির রূপায়ণ রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিক্ষোপে অস্তিত্বশীল করার প্রয়াসী।আর মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে এই প্রয়াস স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের কথা সাহিত্যে শিল্প সফল বলা চলে। কেননা বাঙ্গালী জাতির ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে একাত্তরের যে স্বাধীনতা অর্জন তা কথাসাহিত্যে নিয়ে আসে বিষয় - বৈচিত্র্য, যে বিষয় বৈচিত্র্যের মাঝে সমকালীন শিল্পী সাহিত্যিকরা তাদের শিল্পের মাধ্যমে স্বরুপ অন্বেষণ এবং সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব পালনে হচ্ছেন প্রেরণা তাড়িত।

মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস আমাদের বাংলাদেশের সাহিত্যে এক নতুন রূপে উদ্ভাসিত। বাঙালির জীবন সংগ্রাম, মুক্তির সংগ্রামে পরিণতি পেয়েছে মূলত মুক্তিযুদ্ধের ফলেই। বাঙালি ঔপনিবেশিকতার সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শোষন ও নির্যাতনকে প্রতিহত করেছে এই যুদ্ধেই। মুক্তিযুদ্ধ বাঙ্গালিকে স্বদেশ প্রেমে জাগ্রত করেছে, জাগিয়েছে দেশের প্রতি মমত্ববোধ,এনেছে বাঙালির মনোজগতে এক বিরাট পরিবর্তন। বাংলাদেশের লেখকবৃন্দও এ সকল দায়কে ধারণ করেছেন। স্বদেশের মমত্ববোধের প্রতি করেছেন একাত্মতা ঘোষণা।

Dhaka University Institutional Repository

বাঙালি সত্তা, জাতীয় জীবন চেতনার, ঐতিহ্যের ইতিহাসের ক্ষয় ১৯৪৭ - এর পর থেকেই শুরু হয়েছিল। চূড়ান্ত পরিণতি আসে একাত্তরের ২৫ মার্চের কালো রাতের মধ্য দিয়ে। যদিও তৎকালীন পাকিস্তান সরকার প্রত্যাশা করেছিল বাঙালির বিপর্যয়ের,ক্ষয়প্রাপ্তির কিন্তু বাঙালি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তা প্রতিহত করে প্ররিোধ করে। তাই পরিণতি আসে বাঙালি সত্তার বিকাশ সাধনে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রার্থিত নিরাপদ আশ্রয়ে।

সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় আঙ্গিক হচ্ছে উপন্যাস। আর বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। আমাদের উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ এসেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসের সংখ্যা স্বল্পতা এবং শিল্পমান আশানুরূপ নয়। ফরাসী ও রুশদের গর্ব তাদের বিপ্লব আর আমাদের গর্ব হচ্ছে অমর একুশে ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। বিশ্ব বিখ্যাত রুশ উপন্যাসিক লিউ তলস্তয়ের 'ওয়ার এ্যান্ড পিস' এবং ইলিয়ট এরন বুর্গের 'ফল অব প্যারী' হচ্ছে যুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস। দুটি উপন্যাসই মহৎ এবং কালজয়ী সৃষ্টি। প্রথম এবং দ্বিতীয় দুটো বিশ্বযুদ্ধকে নিয়েও বিশ্ব সাহিত্যের অসংখ্য গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এদেশে লেখালেখি কম হয়নি। কিন্তু উপন্যাসে প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধ প্রতিফলিত হয়েছে না লেখকদের কাল্পনিক মুক্তিযুদ্ধ রূপায়িত হয়েছে সেটাই প্রশ্ন। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে আমাদের সাহিত্যে যে সব উপন্যাস লেখা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে - আনোয়ার পাশার (১৯২৮-৭১) 'রাইফেল রোটি আওরাত'(১৯৭১), শওকত ওসমানের (১৯১৭-৯৮) 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' (১৯৭১) নেকড়ে অরণ্য (১৯৭৩), দুই সৈনিক (১৯৭৩), জলাংগী (১৯৮৬), রশীদ করিমের (১৯২৫) 'আমার যত গ্লানি' (১৯৭৩), সৈয়দ শামসুল হকের (১৯৩৫-০) 'নিষিদ্ধ লোবান' (১৯৮১), 'নীল দংশন' (১৯৮১), 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী' (১৯৮১), 'ত্রাহি' (১৯৮৮), শওকত আলীর (১৯৩৬-০) 'যাত্রা' (১৯৭৬), রাবেয়া খাতুনের (১৯৩৫), 'ফেরারী সূর্য' (১৯৭৪), হাসনাত আবদুল হাই এর (১৯৩৯) 'তিমি' ১৯৭১), রিজিয়া রহমানের (১৯৩৯-০) 'রক্তের অক্ষরে' (১৯৭৮), মাহমুদুল হকের ১৯৪০), 'জীবন আমার বোন' (১৯৭৬), রশীদ হায়দারের (১৯৪১), 'খাঁচায়' (১৯৭৫), 'নষ্ট জোছনায় এ কোন অরন্য' (১৯৮২) 'অন্ধকথামালা' (১৯৮২), আমজাদ হোসেনের(১৯৪২), 'অবেলায় অসময়' (১৯৭৪), 'অস্থির পাখীরা' (১৯৭৬), কিশোর উপন্যাস - জন্মদিনের 'ক্যামেরা' (১৯৮৪), 'যুদ্ধে যাবো' (১৯৯০), 'যুদ্ধ যাবার রাত্রি' (১৯৯১), আহমদ ছফার (১৯৪৩), 'ওংকার' (১৯৭৫), 'অতাল চক্র' এবং একজন আলি কেনানের 'উত্থান - পতন', সেলিনা হোসেনের (১৯৪৭) 'হাঙর নদী গ্রেনেড' (১৯৭৬), হুমায়ুন আহমেদের (১৯৪৮), 'শ্যামল ছায়া', সৌরভ (১৯৭৪), 'আগুনের পরশমনি'(১৯৮৬), '১৯৭১' (১৯৯৫) 'অনিল বাগচীর একদিন' (১৯৯৬), সূর্যের দিন, হারুন হাবীবের 'প্রিয় যোদ্ধা প্রিয়জন' (১৯৮২), মাহবুব সাদিকের ১৯৪৮) 'উত্তাল', মাহবুব হাসানের 'অধ্যসত্য' (১৯৮৮), ইমদাদুল হক মিলনের (১৯৫৫), কালো ঘোড়া (১৯৮৩), ঘেরাও (১৯৮৫), মহাযুদ্ধ(১৯৮৯), বার্লকের অভিমান (১৯৯০), 'নিরাপত্তা হই', মঈনুল আহসান সাবেরের (১৯৫৮) 'পাথর সময় (১৯৯০), 'কেউ জানে না' (১৯৯০), 'পরাজয়' (১৯৯০), সতের বছর পর (১৯৯১), 'কবেজ লেঠেল' (১৯৯২), মঞ্জু সরকারের 'তমস' (১৯৮৪), 'প্রতিমা উপাখ্যান' ১৯৯০, রীতা চক্রবর্তীর 'শরনার্থিনী', শিরীন মজিদের 'অপু বিজয় দেখেনি'(১৯৯০)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

আনোয়ার পাশার মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসের আলোচনায় প্রথম নাম করতে হয় মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আনোয়ার পাশার (১৯২৮-৭১) 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসটি। রাইফেল রোটি আওরাত উপন্যাসটি রচনা করেন ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে জুনের মধ্যে। ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ফ্যাসিষ্ট আল বদর বাহিনী আরো অনেক বাঙালী বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে তাকেও ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে। মৃত্যুর মাঝে অবস্থান করে মৃত্যু বিভীষিকার ছবি এঁকেছেন তিনি এই উপন্যাসে। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালী গণহত্যা যজ্ঞ শুরু করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, তারা চরম পরাজয়ের পূর্ব মূহুর্তে সে যুদ্ধ শেষ করেছিল একই ক্যাম্পাসের বুদ্ধিজীবী নিধনের মধ্য দিয়ে, আনোয়ার পাশা যাদের একজন। ২৫শে মার্চ রাতে সপরিবারে তিনি দৈবক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন কিন্তু ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হবার মাত্র দু'দিন আগে তিনি নৃশংসভাবে নিহত হন।

আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসে ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বসবাসরত শিক্ষক পরিবার এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা তথা বাংলাদেশের চিত্র পাওয়া যায়;

> উনিশ শো একাত্তর খৃষ্টাব্দের সাতাশে মার্চের দিবাগত রাত্রি পার হয়ে আটাশে মার্চের ভোরে এসে পৌঁছলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহিন। ঠিক এর আগের দুটো রাত পঁচিশ ও ছাব্বিশ তারিখের দিন পেরিয়ে যে-দুই রাতের সূচনা হয়েছিল তাদের কথা সুদীপ্ত স্মরন করলেন। সে কি মাত্র দুটো রাত ? দুটো যুগ যেন। পাকিস্তানের দুই যুগের সারমর্ম। বাংলাদেশ সম্পর্কে পাকিস্তানীদের বিগত দুই যুগের মনোকারের সংহত প্রকাশ মূর্তি। আশ্চর্য, এখনো তিনি বেঁচে আছেন। কিন্তু মরে যেতে পারতেন। (পৃঃ ১)

সুদীপ্ত শাহিন নামের আড়ালে যে স্বয়ং আনোয়ার পাশা তা বুঝতে আমাদের অসুবিধা হয় না যখন উপন্যাসে ২৫-২৭শে মার্চে নিহত শিক্ষকদের কারো কারো নাম দেখি। একে একে যে মুখগুলি তার সামনে আসে সহকর্মী অধ্যাপক ডঃ জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, তেইশ নম্বর বিল্ডিংয়ে তাঁর নিকটতম প্রতিবেশী ডঃ ফজলুর রহমান, বন্ধু প্রতিম ডঃ মুকতাদির। ঐভাবে নৃশংস সৈনিকের হাতে পরম শত্রুর মৃত্যুওতা মানুষ কামনা করে না। তারা কি মানুষ যারা ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেবকেও গুলি করে মারে ? ডঃ দেবের মুসলমান পালক পুত্রকে তাঁর সঙ্গে একসারিতে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছে পাকিস্তানী সৈন্যরা। দু'টি লাশ পাশাপাশি পড়ে থাকতে দেখা গেছে। আর দেখা গেছে মধুবাবুর লাশ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রিয় মধুদা। কতো আনন্দের কতো বিষন্নতার কতো বিরক্তির, কতো বিতর্কের স্মৃতি ঐ মধুদার ক্যান্টিন ? লেখকের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে,

> যা কিছু প্রিয় সবি ওরা শেষ করে দেবে।
> অন্ততঃ শেষ করতে চায়। মারতে চায়,
> ধ্বংস করতে চায়। ('রাইফেল রোটি আওরাত' পৃ-৯

বর্বর পাকিস্তানীরা জগন্নাথ হলের মাঠে গর্ত করে সেখানে বাস্তিবাসীদের দিয়ে মৃত আহতদের পুঁতে রেখেছিল। বস্তিবাসীদের ও এসব না করে অন্য কোন উপায় ছিল না। প্রাণ ভয়ে জগন্নাথ হলের একটি ছেলে হলের পাশে স্যাভেজ রোডের একটি গাছে লুকিয়েছিল। ছত্রিশ ঘন্টা পর সেখান থেকে নামার পর মিলিটারীদের হতে ধরা পড়ে। তিনবার ছেলেটি সামরিক জওয়ানদের কবলে পড়লেও সে প্রাণে বেঁচে যায়।

লেখকের ঘরেও ঢুকেছিল পাক সেনারা কিন্তু পায়নি। তিনি বৌ-বাচ্চা নিয় খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন। দু'দিন পর বন্ধু ফিরোজের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। বিল্ডিং-এ যাদের সামনে পেয়েছে সবাইকে হত্যা করেছে, এমন কি ছাদে গরীব নীরিহ বস্তির কিছু লোক পালিয়ে ছিল তাদের ও রক্ষা করেনি। ইকবাল হলেও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল। লেখকের নিজের বিল্ডিংয়ের দোতলায় সিঁড়িতে যে দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন তা সত্যিই হৃদয় বিদারক। দেয়ালে স্ত্রীলোকের মাংসসুদ্ধ একগোছা চুল ঝুলছিলো, হয়তো বর্বরদের সাথে যেতে চায়নি, তাই চুলের মুঠি ধরে টেনেছে।

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পী আমনের পরিণতিও ছিল খুব কষ্টের। পাকিস্তানীরা তার বাচ্চাদের মেরে স্ত্রী পলি, শ্যালিকা রোজি এদেরকে ধরে নিয়ে যায়। এ অবস্থায় আমন পাগলের মতো হয়ে যায়,

> এখন তিনি পথে পথে মাঝে মাঝেই চীৎকার করে উঠছেন - হাম গোলি করেগা, গোলি খায়েগা, আমার ছেলে মেয়েদের তোমরা গুলী করেছ, আমিও তোমাদের গুলী করব; আমার ছেলে মেয়েরা গুলী খেয়েছে, আমিও গুলী খাব, আমাকেও তোমরা গুলী কর, - এসব কথা কি পাগলের কথা ! তবু এখন শিল্পী আমনকে সকলেই পাগল ঠাওরাচ্ছে, এবং এড়িয়ে চলছে।

সুদীপ্তর সামনেই সৈনিকরা গুলী করে আমনকে।

স্ত্রী পলিও এক পাঞ্জাবী অফিসারের সাথে প্রেমের অভিনয় করলে তাকে গণিকালয় থেকে এক বাড়ীতে নিয়ে আসে। সুকৌশলে পাঞ্জাবী অফিসারকে হত্যা করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। পরে মাইন-বুকে বেঁধে একটা মিলিটারী ভরতি ট্রাকের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিল। সে এতগুলি মিলিটারী মাইনের আঘাতে উড়িয়ে দিয়ে যেন তার প্রাণ প্রিয় সন্তানদের তথা গোটা বাঙালী হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেকেই দালালী করেছে। এ উপন্যাসে আমরা তিনজন দালাল খুঁজে পাই। মালেক খালেক ভাতৃদ্বয় ও ফিরোজের চাচা।

উপন্যাস দালাল বুদ্ধিজীবী ডঃ মালেকের চরিত্র বিশদভাবে অংকিত হয়েছে, যিনি দুই দশক দালালী করেও পঁচিশে মার্চ রাতে বাঁচতে পারেননি কারণ তিনি তার ঘরের আওরতদের তুলে দিতে পারেননি পাকিস্তানী সৈনিকদের হাতে। মিঃ মালেক স্ত্রীর টাকায় বিলেত গিয়েছিলেন পি.এইচ.ডি করতে। সেখান থেকে এসে একটা হলের প্রভোষ্ট হয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালী করেও কোন লাভ হয়নি। যদিও বন্ধু জওয়ানদের বলেছেন,

'আমরা খাঁটি মুসলমান। সেনাবাহিনীর সমর্থক আওয়ামীলগিের দুশমন।'

সে বুলিতে ও তাদের খুশী করতে পারেনি। স্ত্রী-কন্যাদের গহনার সাথে গহনা পড়ার মেয়ে মানুষ চেয়েছিল। মালেক সাহেবের আপত্তি থাকারই কথা, সে জন্যেই তাকে প্রান দিতে হয়েছে। পাঁচ বছরের ছেলেটিও রক্ষা পায়নি। স্ত্রী কন্যাদের ধরে নিয়ে গিয়ে আবার ফেরত দিয়েছে। চিকিৎসার জন্য তিনশো টাকাও দিয়েছিলো।

ডঃ খালেক ছিলেন এমন মুসলমান যিনি নামাজ রোজা করতেন না। নারীদের তিনি অতি সহজেই ভুলাতে পারতেন। যিনি শহীদ মিনার ভেঙ্গে মসজিদ বানাতে চান। খালেক সাহেব পাকিস্তানীদের প্রতি এমন অন্ধ ছিলেন যে, তার মতে,

> পাকিস্তানী মুসলমানের ঈমানের পাঁচ স্তম্ভ হচ্ছে - আল্লাহ্,আল্লাহ্র রসুল, কায়েদে আযম, পাকিস্তান আর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী।(রাইফেল রোটি আওরাত' ২৫ পৃঃ)

ফিরোজের চাচা জামাতে ইসলামের সমর্থক। ফিরোজের স্ত্রী মিনাক্ষী নাজমা,সুদীপ্ত, সুদীপ্তর স্ত্রীও কন্যাকে নিয়ে ফিরোজ চাচার বাসায় উঠেছিল। সেখানে থাকাটা কেউ নিরাপদ মনে করেনি। তাছাড়া ফিরোজ ছিলো আওয়ামীলীগের সমর্থক। সে কথা ফিরোজের চাচা ভালো করেই জানতো। রাজার বাগ পুলিশ ফাঁড়ি থেকে তিনজন পুলিশ পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ফিরোজের চাচার বাসায়। তিনি তাদেরকে সমাদরই করেছিলেন। কিন্তু তার পেছনে একটা ঘৃন্য উদ্দেশ্য ছিলো। তাদেরকে আর্মির হাতে তুলে দিয়ে যেন দায়িত্ব পালন করেছে।

মালেক - খালেক দুই ভাই, ফিরোজের চাচা সমগ্র বাঙালী জাতির শত্রু। পাকিস্তানের দালাল। 'ঘরের শত্রু বিভীষণ।'

'রাইফেল রোটি আওরাত' এর ঐসব ঘটনা উপন্যাস নয় বাস্তব। যেমন নয়, 'চার শ্রেণীর মানুষ ওরা দেশ থেকে নির্মূল করবে - বুদ্ধিজীবী, আওয়ামীলীগ, কমিউনিষ্ট ও হিন্দু।' কিংবা সর্বত্রই হানাদারদের কার্যক্রমের মধ্যে এই একটা মিল ছিল ভারি সুন্দর। 'যা পার লুটে পুটে নাও, যুবতীদের হরন কর, অন্যদের হত্যা কর'। এ ঘোষনা দিয়েছে স্বয়ং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। এই হুকুমের জন্যই পাকিস্তানী বর্বর সৈনিকরা বাঙালীদের উপর চালিয়েছে নির্মম হত্যাযজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

আনোয়ার পাশার উপন্যাসটি একদিক থেকে যুদ্ধক্ষেত্রে বসে একজনের প্রতিটি মুহূর্তের কাহিনী বা রণক্ষেত্রের রোজনামচার মতো। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে সৃষ্ট এ শিল্পকর্ম কতটা সত্যনিষ্ঠা লেখকের জীবনের পরিণতিই তার মহান সাক্ষ্য হয়ে থাকবে। মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মৃত্যু বিভীষিকার এমন ছবি আঁকা সত্যই দুঃসাধ্য। আনোয়ার পাশা সেই দুঃসাধ্য কাজ করে গেছেন। তাঁর শিল্পী প্রতিভার এ এক নিঃসন্দেহ প্রমাণ। বাংলাদেশের মাটিতে আগামীতে যারা জন্মগ্রহন করবে তারা এ দেশের ইতিহাসের এক দুঃসহ ও নৃশংসতম অধ্যায়ের এ নির্ভেজাল দলিল পাঠ করে নিঃসন্দেহে শিউরে উঠবে।

এ শুধু একাত্তরের বাংলাদেশের হাহাকারের চিত্র নয়, তার দীপ্ত যৌবনেরও এক প্রতিচ্ছবি। এ গ্রন্থের নায়ক সুদীপ্ত শাহিন বাংলাদেশ আর বাঙালীর আশা-আকাঙ্খা, সংকল্প প্রত্যয় আর স্বপ্ন-কল্পনারই যেন প্রতীক। একাত্তরের মার্চের সে ভয়াবহ ক'টাদিন আর এপ্রিলের প্রথমার্ধের কালো দিনগুলির মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার সংকীর্ণ পরিধিটুকুতেই এ বই-র ঘটনা-প্রবাহ সীমিত, কিন্তু এর আবেদন আর দিগন্ত এ সময় সীমার আগে ও পরে বহু দূর বিস্তৃত। বাঙালীর দুঃখ-বেদনা আর আশা-এষণার এ এমন এক শিল্পরূপ যা সব সময় সীমাকে ডিঙিয়ে এক কালজয়ী অপরূপ সাহিত্যকর্ম হয়ে উঠেছে।

অবাক হতে হয় নির্মম ঘটনাবলীর উত্তপ্ত কড়াইয়ের ভিতর থেকেও লেখক কি করে তার উর্ধ্বে উঠে এতখানি নির্লিপ্ত হতে পারলেন। রাখতে পারলেন মনকে সংযত ও সংহত যা শিল্পীর জন্য অপরিহার্য। সদ্য এবং সাক্ষাৎ ঘটনার এমন অপরূপ শিল্পরূপ কদাচিৎ দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথ যে একবার লিখেছিলেন, "কোন সদ্য আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে তখন যে লেখা ভালো হইবে এমন কোন কথা নাই। তখন গদগদ বাক্যের পালা"। আনোয়ার পাশার বই কোন অর্থেই 'গদগদ বাক্যের পালা' হয়নি। এ এক সংহত, সংযত, নির্লিপ্ত শিল্পী মনেরই যেন উৎসারণ। চোখের সামনে ঘটা ঘটনাবলীর উত্তাপ তাঁর শিল্প-সত্তাকে কেন্দ্রচ্যুত করেনি কোথাও, লেখকের জন্য এর চেয়ে প্রশংসার কথা আর হতে পারে না।

উচ্চতর শিল্প-কর্মের জন্য স্থান-কালের দূরত্বের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। আনোয়ার পাশার জন্য তার প্রয়োজন হয়নি। যথার্থ শিল্পী বলেই এ হয়তো তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ঘটনাকে ছাড়িয়ে পৌছেছেন ঘটনার মর্মলোকে।

এ তাঁর শেষ বই, জীবনের শেষ বই-প্রত্যক্ষ আর সাক্ষাৎ ঘটনাবলীকে তিনি উপন্যাসের রূপ দিয়েছেন এ গ্রন্থে। ঢাকায়, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে, যে বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের সব রকম প্রগতিলীল আন্দোলনের উৎস, তার উপর পাক-হানাদারদের বর্বর আক্রমণ আর তাদের অমানুষিক তান্ডবলীলার এমন নিখুঁত ছবি, এমন শিল্পোত্তীর্ণ রূপায়ণ আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ইতিহাসের দিক দিয়েও এ বই-র মূল্য অপরিসীম। এর ভাষা আর রচনা শৈলী এক আশ্চর্য শিল্পরূপ পেয়েছে।

এ গ্রন্থের আগাগোড়া যে স্বাধীনতার স্বপ্ন তিনি দেখেছেন, যার প্রতীক্ষায় তিনি প্রহর গুনছিলেন, সে স্বাধীনতার শুভলগ্নের মাত্র দুই দিন আগে পাকহানাদারদের দোসরেরা নিজের পেশা আর আদর্শে আত্মনিবেদিত প্রাণ এ নিরলস শিল্পীকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। শিল্পীকে হত্যা করা যায় কিন্তু শিল্পকে হত্যা করা যায় না - তার অবিসম্বাদিত প্রমান এ বই 'রাইফেল রোটি আওরাত'। এর প্রতি ছত্রে ঘাতকদের প্রতি ধিক্কার ধ্বনি যেমন আমরা শুনতে পাই তেমনি শুনতে পাই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সূর্যের উদয় মুহূর্তে নব জীবনের আগমনী ও।

"পুরোনো জীবনটা সেই পঁচিশের রাতেই লয় পেয়েছে। তাহা তাই সত্য হোক। নতুন মানুষ নতুনপরিচয় এবং নতুন একটি প্রভাত। সেআর কত দূরে ? বেশি দূর হতে পারে না। মাত্র এ রাতটুকু তো। মা ভৈঃ। কেটে যাবে।"

এ আমোঘ ভবিষ্যৎ বাণীটি উচ্চারণ করেই তিনি তাঁর জীবনের শেষ লেখাটি শেষ করেছেন। যে নব প্রভাতের জন্য এত দুর্ভোগ, এত আশা, এতখানি ব্যাকুল প্রতীক্ষা তা সত্য সত্যই এলো কিন্তু আনোয়ার পাশা তা দেখে যেতে পারলেন না। তাঁর এ অন্তিম রচনার সঙ্গে দেশবাসীর এ বেদনাটুকুও যুক্ত হয়ে থাকে। এ বই একাধারে ঐতিহাসিক দলিল আর সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি।

Dhaka University Institutional Repository

শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

শওকত ওসমান (১৯১৭-৯৮) একাত্তরের অপরার্ধে কলকাতায় বসে লিখেছেন "জাহান্নাম হইতে বিদায়" (১৯৭১), বিষয় হলো দেশ ছেড়ে বিদেশে আশ্রয় গ্রহণ। এই বইটি উৎসর্গ করেছিলেন 'দুঃখিনী জননী' বাংলাদেশ ও তার বীর সন্তান মুক্তি ফৌজদের জন্য। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র শিক্ষক, গাজী রহমান, শহর থেকে দূরে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন - এক প্রাক্তন ছাত্রের বাড়িতে, ঢাকারআরো অনেকের মতো, ছাত্র ইউসুফের বউ সখিনার ভাই খালেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, খালেদের কোন খবর নেই, তিনি মিথ্যা প্রবোধ দেন খালেদ মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছে। তার একটি অভিজ্ঞতা, নৌকায় মেঘনা দিয়ে নরসিংদী থেকে নবীনগর যাবার সময়, এক বৃদ্ধ কৃষকের কাহিনী, কিভাবে পাক সেনার বন্দুকেরমুখে বাঙালীদের দিয়ে দোকান পাট লুট করিয়ে তার ছবি তোলে পরে গুলী করে মারে। দুনিয়াকে দেখাবে বাঙালীরা লুট করে আর পাঞ্জাবীরা শান্তি বজায় রাখে তাকে নিরাপত্তার খাতিরে আশ্রয়স্থল পরিবর্তন করতেহয়, আবার নৌকা পথে নুতুন নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে। পার্থিব সম্পদের মধ্যে এখন তার, একটা টুথ ব্রাশ, পেস্ট। দু'টো লুঙ্গি। পাজামাছেঁড়া পিরহান, ছোট তোয়ালে। একটা ঝোলা ব্যাগ। নৈশকালে সব আধেয়-সহবালিশ। জয়বাংলা ... ? নৌকাপথে মাঝি তাকে প্রশ্ন করে 'সাব, একডা কথা জিগামু ?' 'অ্যা, কি জিজ্ঞেস করবে ?, '--- শেখ মুজিব কি অ্যারেষ্ট অইছে ?''কাগজে তো তাই লিখছে।' ওই ছাপানো কাগজের কথায় আপনেবিশ্বস রাখেন।' 'তা ঠিক। কিন্তু তুমি কি মনে করো?' -- ' আমি জাহেল মানুষ, মুরখখু সুরুক্ষু। আপনি কি মনে কারেন - কন ?' 'মনে হয়, শেখ মুজিব অ্যারেস্টেড - ।' --'সাব, শেখ মুজিবেরে ধইরব কোন হালা। শেখ মুজিবর অ্যারেষ্ট অইছে না। আমি কই হোনেন -' 'শেখ মুজিব ফেরার। নানা বেশে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতাছে। তাজ্জব, আপনে লিখাপড়া মানুষ এ খবর জানেন না।' শিক্ষক অনুভব করেন, ব্যক্তি নামে আবদ্ধ হয়। তারপরসাধনায় ব্যক্তি হয় ভাবমূর্তি। আইডিয়া - কে কোনপশু শক্তি বন্দী করতে পারে ? অধ্যাপকের নৌকোয় যাত্রীওঠে মা ও ছেলে, ছেলের বাপ বেঁচে আছে কি-না জানতে চাইলে বালক মাথা নত করে, মুখ তোলে না, কোন কথা বলেনা। জবাব দেন মা, '--ফালু, উনারে ক'না ব্যাডা। বাজানরে আল্লা নিছে না মিলিটারী নিছে।' --'মিলিটারী নিছে, 'হ মিয়াভাই। আল্লায় নিলে তো 'দিলে' বুঝ দিতাম, যার মাল হেই নিছে। নিল শয়তান মানষে।' তিনি আরো জানতে পারেন ঐ মহিলার আর এক ছেলে মুক্তি ফৌজে।

গাজী রহমান এরপর যান এক পরিত্যক্ত মফস্বল শহরে উকিল বন্ধু রেজা আলির কাছে, যে গ্রাম ছোড় এসেছে মৃত্যুর বিভীষিকা থেকে রেহাই পাবার জন্যে। সে বাড়ীতে খাটের তলার বাসিন্দা কিরণ রায়, বামপন্থী রাজনীতি করেন। উকিল রেজা আলি, শিক্ষক গাজী রহমান, বিপ্লবী কিরণ রায়ের অন্ধকারের সংলাপ, রেজা আলি বলেন, 'একটা সভ্য দেশের আর্মি খুঁঝে খুঁজে তার মাইনরিটিদের মারছে প্রথম একমাস বাঙালী মেরেছে। হিন্দু মুসলমান বাছ-বিচার নেই। একন দেখে দেখে হিন্দু নিধন করছে। এইভাবে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ আনা যাবে, বেজন্মরা ভাবছে। সেই পুরাতন কায়দা। সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরজের ও পুরাতন কৌশল। জিন্না সাহেবের জন্মদত্ত জোঁক। .... তা ছাড়া কত মুসলমানকে লুঙ্গি তুলে প্রমাণ করতে হয়েছে সে মুসলমান।' -- 'এখানে তো ফেল হয়ে যাবো, রেজা। --- কিন্তু এই পরীক্ষার কথা আগে ভাবিনি। মুসলমানের মধ্যে থাকতাম, তাই নিশ্চিত ছিলাম।' এখনও মুসলমানদের মধ্যে থাকছে।' 'কিন্তু তারা বাঙালী নয়।'

গাজী সাহেব আবার পথে বের হন তবে এবার নৌকায় নয় বাসে। গাইড সৈয়দ আলি গন্তব্য সীমান্তের ওপারেপাক আর্মীর চেক পোষ্ট অতিক্রম করার অভিজ্ঞতা হয় তার, যেকানে দু'জনকে নামিয়ে নিয়ে যায় পাকসেনারা, তারপর পায় দল সীমান্তের পথে, সহযাত্রী আলম, যে পায়ে গুলী খেয়েছিল আজিমগঞ্জ এলাকায় যখন ব্রাহ্মনবাড়িয়া মুক্তিফৌজের দখলে ছিল। পনের জন পাঞ্জাবী সৈনিক পালাচ্ছিল কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের দিকে। তাদের ঘেরাও করেছিল হাজার হাজার গ্রামের মানুষ, জয়বাংলা আর বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের ওপর, পাঞ্জাবীরা গুলী বর্ষণ শুরু করে বহু বাঙালী হতাহত হয় কিন্তু তবুও পাল্টা আক্রমন করে বাঙালীরা লাঠিসোটা নিয়ে। পাঞ্জাবীরা মসজিদে ঢুকেও রেহাই পায়নি, বেরিয়ে আসতে হয়েছিল। ঐ পনেরজন পাঞ্জাবী নিধনের জন্য ৬৫ জন বাঙালী নিহত এবং ২০০ জন আহত হয়েছিল। সীমান্তের যাবার

Dhaka University Institutional Repository

জন্যে নৌকোয় বিল অতিক্রম করতে হয় তাকে, সৈয়দ আলি গাজী রহমানকে ফিসফিস করে জানায় স্যার আমরা বর্ডারেরখুব কাছাকাছি এসে পড়েছি। নৌকায় খুব জোর আর তিন মাইল।' অচমকা ধাক্কা খান গাজী রহমান।

নিরাপত্তার জন্যে, জীবনের জন্যেও দেশত্যগ এবং অন্যদেশে আশ্রয় নেয়াটা যে সহজ নয় 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' উপন্যাসের উপসংহারে তা ফুটে উঠেছে। নিজের দেশ জাহান্নাম হলেও, তা বর্বর পিশাচদের দখলে থাকলেও যে সে দেশ ত্যাগে দ্বিধা তা স্পষ্ট। 'গাজী রহমানের দোলাচল অত সহজে কাটে না। গত দেড় মাসের ছবিগুলো হঠাৎ তার সামনে নিরন্তন ক্রমিকতায় খুলে যেতে লাগল। তখন সে ভাবল, সীমান্ত অতিক্রম অগস্ত্য যাত্রা নয়। গাজী রহমান সীমান্ত অতিক্রমের পূর্বে সৈয়দ আলির পরিচয় জানতে চাইলে সে বলে '---গোলামের কোন পরিচয় থাকে না, স্যার। গোলাম গোলামই। স্বাধীন বাংলাদেশই হবে আমার পরিচয়।' ঐ অখ্যাত চেহারা, অজ্ঞাত কুলশীল যুবকের কাছ থেকে শিক্ষক গাজী রহমানের সীমান্ত অতিক্রমের পুর্বে ঐ শেষ শিক্ষা। পেছনে ফিরে যখন তিনি ছেড়ে আসা স্বদেশের পানে চাইলে তখন অনুভব করলেন, 'পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল তার চোখের কোটরে বন্দী। ধর্ষিতা বাংলাদেশ তার অন্তিরস্থিত বিদীর্ণতা- অধীর লাভারূপী সকল জ্বালা প্রবাহ নিসর্গের মোড়কে ঢেকে শান্ত শুয়ে আছে।' গন্তব্য টিলার কাছাকাছি আসা মাত্র তিনি অনুভব করলেন কোথাও হয়ত আমরাবতী নেই পৃথিবীতে কিন্তু মানুষের পোড়া মাংস গন্ধ অন্তত তার ঘ্রাণ শক্তি আর পীড়িত করবে না।

গাজী রহমান যখন পুনরায় ফেলে আসা জন্মভূমির দিকে মুখ ফেরান তখন মনে মনে উচ্চারন করেন, 'আবার আসিব ফিরে ধান সিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়'। আবার গন্তব্যমুখী হন গাজী রহমান মুখে তার 'জয়বাংলা'। 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' উপন্যাসে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালীর নিজ দেশে পরবাসী জীবন এবং হানাদার কবলিত বাংলাদেশের গ্রাম নগর ওপথ প্রান্তরের পরিচয় পাওয়া যায় যা শওকত ওসমানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ।

১৯৭১ সালে কলকাতায় বাংলাদেশের উদ্বাস্তুরা শরণার্থী শওকত ওসমানের রচনা 'নেকড়ে অরণ্য' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের সময় বর্বর পাকিস্তানী সৈন্যদের ব্যাপক নারী ধর্ষণের চিত্র, মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানীদের সবচেয়ে লজ্জাষ্কর, বেদনাদায়ক ও মানবতাবিরোধী কর্মকান্ডের 'আত্মিক দলিল'।

'নেকড়ে অরণ্য' - উপন্যাসের মূলকাহিনীর প্রধান্য হিসেবে উঠে এসেছে বাঙালী নারী নির্যাতনের নির্মম অধ্যায়। আমরা পাক হানাদার বাহিনীর হাতে বাঙালী মা বোনদের ধর্ষিত হবার অকথ্য নির্যাতন ভোগ করার কাহিনীর কথা জানি। কিন্তু কে কিভাবে ধর্ষিত হয়েছে অত্যাচার সহ্য করে স্বাধীনতার স্বাদ পাবার আকাঙ্খায় প্রহর গুনেছে, তার হয়তো প্রত্যক্ষদর্শী নই। কিন্তু শওকত ওসমান তাঁর এ গ্রন্থে পাকহানাদার কর্তৃক নারী নির্যাতনের যে মর্মন্তুদ চিত্র বিম্বিত করেছেন তাতে আমাদের প্রত্যক্ষদর্শী হতে সাহায্য করে। এখানে বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বয়সের বাঙালী মা বোন কলঙ্কিত হয়েছে।

জায়েদ, তনিমা, সখিনা, রাশিদা বিবি, আমোদিনী প্রমুখ বাঙালি নির্যাতিত নারীদের প্রতীক। তনিমার বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের কাছাকাছি, শিক্ষিত মহিলারপ্রতীক। ভাষা আন্দোলনের চেতনায় সে সমৃদ্ধা। সখিনা তরুনী, যৌবনের বয়স শরীরে, শিক্ষিতা ও গ্রাম্য নির্যাতিতা চাষী বউয়ের প্রতীক হচ্ছে রাশিদা বিবি। আমোদিনীর স্বামী ছিলো ডাক্তার। এক সন্তানের জননী। জায়েদা ও শিক্ষিতা রমনীর প্রতীক।

নাম উল্লিখিত পাঁচজন ছাড়াও অনেক নির্যাতিতা রমনী এখানে পড়ে আছে। কেবল চারজন ছাড়া বাকী সব উলঙ্গ। লেখকের ভাষায় বলা যায় -

"এই বিবস্ত্রের রাজ্যে ওই চারজন শুধু সায়া পড়েছিল আর যে দিকে তাকাও স্বর্গীয় উদ্যান। এখানে আদম অনুপস্থিত। সবাই এখানে ঈভ।" পৃ: ১৫

"ঝিলাম নিবাসী ক্যাপ্টেন রেজা খান যদিও এখানকার তত্ত্বাবধায়ক তবু এখানে দেহ লুটার জন্যে আসে ক্যাপ্টেন, মেজর,কর্ণেল আরো অনেকেই। একেক জন আসে একেক রুচি নিয়ে"। (পৃ ঃ ৩৩)

"নেকড়ে অরন্যের" রমনীকুল মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। এরা জানে বিজাতীয়দের হাতে নির্যাতিত হওয়ার পেছনে কারণ একটাই-মুক্তিযুদ্ধ, দেশের মুক্তি, বাঙালির মুক্তি। এই যুদ্ধে অংশ নিয়েছে যে তাদেরই তাই, বাবা, কিংবা আত্মীয় স্বজন। তাই এরা ধর্ষিতা হোক না কেনো, মর্মান্তিক নির্যাতনের শিকার হোক না কেনো এদের

Dhaka University Institutional Repository

অম্বিষ্ট অর্জনের চেতনা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে না। বাইরে কখনো কোন বন্দুকের গুলির শব্দ পেলে ওদের মুহূর্তে দীপ্তি পেয়ে চোখে মনের ভেতরে সাহস এসে উকি দিয়ে গেছে, ক্ষনিকের জন্যে হলেও।"এই জন্যে এরাকান পেতে থাকে গুলির শব্দের জন্য। ওদের কণ্ঠে মাঝে মধ্যে দৃঢ়তার সাথে সাথে বলতে শোনা যায় -- "ওই শব্দের জন্যেই তো বেঁচে আছি।"

চাষী বউয়ের কাছে বন্দী শিবিরের নির্যাতিতরা যখন শুনেছে মুক্তি বাহিনী চারদিকে প্রতিরোধ শুরু করেছে। তাদের মেশিনগান আছে, অন্য অস্ত্রসস্ত্র আছে, তারা পুল ওড়াচ্ছে, ওৎ পেতে খান শয়তানের উপর হামলা চালাচ্ছে, তখন ওরা জীবন্ত হয়ে উঠেছে, নতুন করে বাঁচার নামতা শুনেছে। চাষী বৌ-এর কাছে মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠার কথা শোনে যেসখিনা গুদামে আসা অন্দি প্রায় অপ্রকৃতস্থ থাকতো সেও গুন গুন গান ধরে প্রেরণা খোঁজে, আমোদিনীর গলা জড়িয়ে ধরে। কিংবা গুদাম ঘরের দূরবস্থার কথা ভেবে আমোদিনী যখন প্রতিবাদী হয়ে বলে ওঠে এখানে একটি বজ্রাঘাত হয় না কেন ? জায়েদা এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদকে আরো জোরালো করে অন্যভাবে - "বজ্রাঘাত .... "না অন্য আঘাত হচ্ছে। এখানে নয় বাইরে। " কি করে বুঝলি আমোদিনী প্রশ্ন করলে আবারো সে বলে ওঠে - "যেদিন বাইরে নানা শব্দ শুনি যেদিন আমাদের এই হারেমে শান্তি থাকে"।

কিংবা সখিনার স্বপ্নের কথাইধরা যাক - আমোদিন, জায়েদা, সখিনা যখন তাদের বন্দী শিবিরে নবাগত ধর্ষিতা তরুনীর আগমনে দিশেহারা তখন ও সখিনার দু'ছোখে স্বপ্ন জাগে। স্বগোক্তিতে সে তার প্রিয়তম সুপুরুষের বীরত্ব কামনা করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মধ্যদিয়ে,

> তুমি এখন কোথায় ? মুক্তিফৌজে গিয়েছ নিশ্চয়। আর কখন ও যদি তোমার সঙ্গে দেখা হয় এবং আমি জানতে পারি, তুমি তোমার বলিষ্ঠ বাহু দিয়ে রাইফেল ধরনি, মর্টার ছোড়নি আমি তোমাকে তখন খারিজ করে দেব আমার বুক থেকে। .. না, আমি আর তোমার কাছে যেতে পারব না, আজাদ অনাঘ্রাতা কুসুমের মত আমি তোমাকে নিজের হাতে তুলে দেব ভেবেছিলাম - শুয়োরের পাল গোলাপ বাগান তছনছ করে দিয়ে গেল - জননী বাংলাদেশ কোথায় ? তার বীর সন্তানেরা আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।" পৃঃ ২৪-২৫

শুধু তাই নয়,

> এ শিবিরে সখিনার মনে হয় গায়ে অসংখ্য পোকা কিলবিল করছে । সারা গায়ে চরছে কোটি কোটি কোচো । এ জন্য তার বিদ্রোহ এবং প্রতিবাদ আরো জোরালো হতে দেখা যায় । সখিনা তার দেহ থেকে সেই কল্পিত কেচোগুলো ছাড়িয়ে ফেলতে বারবার খিমচাতে লাগল,যেখানে খুশী হতো। এমনিতে তার আঙ্গুলের নখ বড়। খিমচানির চোটে রক্ত ঝরতে লাগলো কয়েক জায়গা থেকে। তখন সঙ্গীনিদের হুশ হয়। তানিমা তার হাত দুটো ধরে ফেলে সে অনুনয় মাখা গলায় বলে, ছেড়েদাও পোকাগুলো আমাকে খেয়ে ফেললে।" (পৃঃ ২৬)

বন্দী শিবিরে একজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পাকদোসররা ফেলে রেখে গেলে, মুক্তিযোদ্ধাকে বন্দী শিবিরের রমনীরা সেবা দিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনলে, চোখের সামনে যখন সে দেখতে পায় উলঙ্গ রমনী, ক্ষতবিক্ষত শরীরের মুক্তিযোদ্ধাটি তখন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে তুলে ধরেছে এবং তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভূমি থেকে। লেখকের বর্ণনা, মুক্তিযোদ্ধা, বন্দী শিবিরের তরুনী ও রমনীদের কথোপকথন থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হতে পারে । যেমন,

> বুক চোখ খুললো। কিন্তু বড় চেতনার শিকড় টান টান নেচে ওঠে। চোখ মেলে তাকায় সে। সামনে দুজন উলঙ্গ রমণী। রশিদা বিবিকে সে আর সুযোগ দেয় না, ধড়মড়িয়ে উঠে বসে চতুর্দিকে চোখ ফেরায়। তারপর নিজের দুই চোখ দুই হাতে ঢেকে চীৎকার দিয়ে ওঠে দুখিনী বাংলাদেশ তোমার সন্তানদের দুর্দশা দেখে যাও। এই বেইজ্জতি -

Dhaka University Institutional Repository

মা বোন যারা এখানে আছেন আমার দুঃখ আপনাদের বেইজ্জতির প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ নেওয়ার সুযোগ আমারহবে না। তবে বাংলাদেশে মনুষত্ব মরে যায়নি। এই জানোয়ারদের সমুচিত সবক দেবে বৈ কি আমার তরুণ ভায়েরা ..... মা নেকড়েরা আমাকে বাঁচতে দেবে না। তাই যতক্ষন আছি আপনাদের সঙ্গে কথা বলে নেই। তবে আমি আপনাদের বলছি। আমার আফসোস নেই কোন। আমি স্টেনগান দিয়ে তিনটে পশ্চিম পাকিস্তানী জানোয়ার এ পর্যন্ত মেরেছি। আমার কোন আফসোস নেই। আফসোস খামখা ভুল করে ধরা পড়ে গেলাম। আফসোস আমি জানতাম না। মা বোনদের ওরা এভাবে পশুর মত বেইজ্জতি করে। তবে খবর চাপা থাকবে না। আমাদের প্রতিজ্ঞা আরো শক্ত হবে। জায়েদা খামের কাছে হাঁটুতে মাথা গুঁজে জোরে জোরে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে দেখে আহত যোদ্ধাটি দৃঢ়তার সাথে জানিয়েছে কেঁদো না বোন। দেশের মানুষ জেগে আছে দাদ নিতে। পৃ: ৪৬-৪৭

এছাড়াও সে মৃত্যু আসন্ন দেখেও ভীত হয়নি শান্ত্রীদের সে জানিয়েছে,

চলো শুয়ার কা বাচ্চা লোগ কাঁহা লে জায়েগে। মাই মুক্তিফৌজ কা জওয়ান হু। আমি জননীবাংলাদেশের সন্তান। পৃঃ ৪৮

মুক্তিযোদ্ধা যুবকটির এই অবস্থা দেখে তানিমা, জায়েদা, আমোদিনী এরাও কিছু একটা করতে চেয়ে আত্মপ্রেরণা পেয়েছে। যেমন, "আমাদের কিছু করা উচিত।" যদিও রশীদা বিবি দ্বিমত পোষণ করেছে "কী করতা পারি মা। তবুও জায়েদা তাদের প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে কটা সিপাই অন্ততঃ সবাই মিলে আঁচড়ে কামড়ে শেষ করতে পারি।"

উপন্যাসের পরিণতিতে যদিও আমরা জায়েদা আমোদিনী ও সাখিনাকে আত্মঘাতী হতে দেখি, দেখি তানিমাকে এক ধরনের আত্মঘাতী পথ বেছে নিতে এবং এটা কারো দৃষ্টিতে কোনো সদর্থক দিক নির্দেশনার প্রশ্ন উত্থাপিত না হলেও নঞর্থকতার মধ্যেও এদের চেতনা বাঙালি রমনীর বীরত্ব গাঁথাতেই পরিস্ফূটিত হতে দেখি। কেননা ওরা বার বার বেঁচে থাকার প্রত্যাশা করেও বেঁচে থাকার সার্থকতার প্রশ্নে এরা দ্বিধায় দোলায়িত। কেননা - এটাই তো ভাবা স্বাভাবিক যে কী হবে আর বেঁচে থেকে। স্বামীর কাছে মুখ তুলে তাকানোর সাহস ও সব সৈন্যরা কেড়ে নিয়েছে। তহি

মা, বাপ, আত্মীয় স্বজন সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। সে কেমন ধরনের বাঁচা ? পৃঃ ২১

তবুও বাঁচার প্রশ্নে এরা সংশয়কে কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলো। কিন্তু আহত রক্তাক্ত মুক্তিযোদ্ধাটিকে বন্দী শিবিরে আনার পর এদের অন্তরাত্মায় যে ভাঙ্গন দেখা দেয় তাতে তারা নতুন চেতনার স্ফুলিঙ্গ দেখতে পায়। ক্যাপ্টেন রেজার বন্দী শিবিরে আগমন লক্ষ্য করে চাষী বউ রেজার পথ রুদ্ধ করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে প্রৌঢ়া চাষী বউ, রশীদা বিবি রেজার শিকার হয়। এ দৃশ্য দেখে তানিমা স্তির থাকতে না পেরে প্রতিবাদী কণ্ঠে সে চিৎকার করে গালি ছুড়ে,

রঞ্জিত সিংকে হারামজাদ, লোগ করো করো আপনা মাকো করো -
করো মার্দা চোর্দ। পৃঃ ৫৪

এই প্রতিবাদ রেজাকে বিদ্ধ করে বুলেটের মতো। রেজা গুলি করে তানিমাকে লক্ষ্য করে।

তানিমা এক ধরণের আত্মঘাতী পথ বেছে নিয়েও তার মৃত্যু একটা প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে হতে পেয়েছে এটা কম প্রাপ্তি নয়। কেননা - এ শিবিরের সবাই জানে শান্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করলে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গিয়ে মৃত্যুও হতে পারে। যে কোনো অপমানের নির্দিষ্ট মাত্রা থাকলেও পরিচিত পরিবেশে তার মাত্রা সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারে। রেজার হাতে প্রৌঢ়ার ধর্ষিতা হওয়া - এই ধরণের অপমানের বোঝা রশিদা বিবি ছাড়াও তানিমা, জায়েদা, আমোদিনী ও সখিনাকে ভেতরে একটু বদলিয়ে দিয়েছে বৈকি।

তানিমা রেজার গুলিতে নিহত হবার পর জায়েদা ও আমোদিনী কৌশলে গলায় ফাঁস নিয়ে আত্মঘাতী হয়। সখিনা তার ধারালো হাতের নখ দিয়ে পেটে আঁচড় কেটে পেট ফেড়ে, ফাড়ানো পেটে ও মুখে কাপড় চেপে ধরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। এরা মৃত্যুর মুখোমোখি হবার আগেও তাদের চেতনাকে জানান দিয়ে গেছে 'জায়েদা তার সায়া খুলে

Dhaka University Institutional Repository

ফেললো। তারপর বন্দুকটা বের করে নিলে অতি দ্রুত, উলঙ্গ সে আমোদিনীর গলা জড়িয়ে বললে,

> আজ সকলের সঙ্গে আমি এক। আমাদেরও উলঙ্গ থাকা উচিৎ ছিল। জায়েদা তাকে আরো নিবিড় জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো, এমন দেখাও হয় জীবনে। হিন্দু মুলমান। হতভাগারা হিন্দু মুসলমান করে করে গোটা দেশটাকে এখানে এনেছে। এবার যদি শিক্ষা হয়। (পৃঃ ৬১)

অর্থাৎ এখানে এরা আত্মপ্রেরণা ও অন্বিষ্ট অর্জনের চেতনা খুঁজে পেয়েছে।

গ্রাম্য কৃষক পরিবারেরশহরেকলেজ পড়ুয়া ছাত্র জামিরালির মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহন এবং সে পরিস্থিতিতে বিম্বিত তার পরিবারের চালচিত্র 'জলাংগী' (১৯৮৬) উপন্যাস। চালচিত্র বাংলাদেশে পাকিস্তানী খান সেনাদের নিষ্ঠুরতার।

'জলাংগীর' কাহিনী মুক্তিযুদ্ধের অবরুদ্ধ নয়মাসের পটভূমি হলেও যুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি এখানে লক্ষনীয়। আর সে প্রস্তুতির সাথে ক্রমে সম্পৃক্ত হচ্ছে এদেশের মুক্তিকামী মানুষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে স্কুল কলেজ বন্ধ হচ্ছে। শহরের ছাত্র ছাত্রীরা তাদের হোস্টেল থেকে গ্রামের বাড়িফিরছে। শহর ফিরতি ছাত্র জামিরালি বাঁকাজল নামের গ্রামে এসে প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করছে দেশের পরিস্থিতি নিয়ে। তার কথাবর্তা থেকে উঠে এসেছে এদেশের সার্বিক পরিস্থিতি ভালো নয়। স্কুল, কলেজ গেটে, ঢাকা শহরের কলকারখানা,অফিস, আদালত সব বন্দ করা হয়েছে শেখ মুজিবের নির্দেশে। ছয় দফার বিষয়টি থেকে জামিরালি তার মাকে পূর্বাবাস দিচ্ছে লড়াইয়ের, যুদ্ধের।

অবশ্য পুত্রের মনোভাবের সাথে পিতা ফয়েজ মৃধার ভাবনাও মিলে যায়। কেননা - ফয়েজ মৃধাও তো চব্বিশ বছর আগে পাকিস্তান হওয়ার সময় প্রত্যাশা করেনি পূর্ব বাংলার অভিশপ্ত রূপ। সে তখন ভেবেছিল অধিক স্বাচ্ছন্দে। ও নিশ্চিন্তে জীবন অতিবাহিত হবে তার কিন্তু না, তেমনটি আর ঘটেনি তার ভাগ্যে। যা পেয়েছে জীবনে সে, তা গতরের পরিশ্রমে। সুতরাং ছেলের চেতনার সাথে সাথে ফয়েজ মৃধাও মনে করে একটা বিহিত হওয়া দরকার।

ফয়েজ মৃধার জ্ঞাতি কাজেম মৃধা জামিরালির সম্পর্কে চাচা এবং তার প্রিয়তমার পিতা। কাসেম মৃধার সাথে জামিরালির কথোপকথোন কাজেম মৃধা শহরের কথা জানতে চাইলে সে জানায় "শহরে বয়কট চলছে" এ কথার সাথে সমর্থন জানিয়ে কাজেম মৃধাও আবার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

> "হেত চলবই । ছ'দফা না পাওয়া পর্যন্ত আমাগো কইলে গাঁয়ে আমরাওখাজনা বন্ধ কইরা দিমু।" পৃ: ২১
>
> জামিরালি যেনো আরওশক্তি সঞ্চয়করে এবং বলে ওঠে
>
> "পাকিস্তান হৈল। খুবত সুখ পাইলাম। আগে ইংরেজ লুটতো। অহন পাঞ্জাবী লোটে ! তা আর অইতে দিমু না। এই আগুন ছুইয়া কইছি চাচা" পৃ: ২১

> দেখতে দেখতে সময় গড়ায় দ্রুত। ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে শেখমুজিব ডাক দিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের --
>
> তোমাদের হাতে যা আছে তাই নিয়ে তোমরা ঝাঁপিয়ে পড় ... এবারের সংগ্রাম ...স্বাধীনতার সংগ্রাম....। পৃঃ ৩১-৩২

আরো দেখা যায় গাঁয়ের যুবকেরা নানা কল্পনায় মত্ত। অনেকে লাঠি তৈরী করে। যদি গন্ডগোল লাগে, তারা পিটিয়ে শায়েস্তা করে ফেলবে পাঞ্জাবীদের গঞ্জের কাছে মিলিটারী ট্রেনিং নিচ্ছে অবসর প্রাপ্ত এক সামরিক কর্মকর্তার অধীনে। এর মধ্যে ২৫শে মার্চের কালো রাত সভ্যতাকে নিমজ্জিত করে দিয়ে বাঙালীর প্রতি শুরু হয়ে যায় হত্যা, লুণ্ঠন, জুলুম। পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী, পৈশাচিক বাহিনী নেমে যায় বাংলার শহরে,বন্দরে এমনকি পল্লীতেও।

জামিরালি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে আত্ম-প্রেরণাকে জাগ্রত করেছে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে। বাঙালীর মুক্তির জন্যে। সে অকুতোভয় যুদ্ধের ব্যাপারে। সে কামনা করেছে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার একদিন হয়তো নিশ্চিত হবে। তাই তার বৃদ্ধ মা বাবা এবং প্রিয়তমা হাজেরাকেও উপক্ষো করতে দ্বিধা করেনি। যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। চারিদিকে যুদ্ধ।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধকালীন সময়ে উত্তরবঙ্গ থেকে জামিরালির তার বাড়ীতে আসে। কিন্তু বাবা-মার সাক্ষাৎ মেলেনি। মেলেনি হাজেরার। কারণ বাঁকা জল গ্রাম খানি মিলিটারিরা আহগুনে পুড়েছে। এখানেই তার বাবা-মা মারা যায় হাজেরা তার বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্যে কাজীর চরে রওনা হলে পথে রাজাকারদের হাতে ধৃত হয়ে মেজর হাশেমের ক্যাম্পে চালান হয়। ওখানে গিয়ে তাকে নতুন সমস্যায় পড়তে হয়। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাকে শেষে বলা হয়, ক্যাম্পে পাশের কামরায় বন্দী ধৃত রমনীদের মধ্যে থেকে যেকোন একটি মেয়ের সাথে প্রেম করার জন্যে। যে মেয়েটিকে তার সামনে দাঁড় করানো হয় তা যে হাজেরা তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। এক সময় মেজর হাশেম এদের দিয়ে আদিম নগ্নতায় উপস্থিত করাতেবাধ্য করে এবং শেষে তাদের তৈরি দালাল দিয়ে গ্রামবাসী নিয়ে একটি জনসভার সামনে জামিরালি ও হাজেরাকে উপস্থিত করা হয়।

জামিরালি ও হাজেরাকে মেঘনার বুকে গলায় পাথর বেধে ঝুলিয়ে নৌকার কিনারা থেকে ফেলে দেয়া হয়।জামিরালি মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও যে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়নি - তার মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে এসেছে 'জয়বাংলা জয় .....।'

জামিরালি তখনও মনে করেছে বিজয় আমাদের অবশ্যম্ভাবী।

Dhaka University Institutional Repository

রিজিয়া রহমানের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

রক্তের অক্ষরে'(১৯৭৮) রিজিয়া রহমানের (১৯৩৯-০) একটি অতুলনীয় উপন্যাস। প্রায় দু'দশক পরেও এ উপন্যাসটির সজীবতা নষ্ট হয়নি। পাঠকের হৃদয়ে এর প্রভাবশীলতার ক্ষমতায় ঘুন ধরেনি। যখনই কেউ এ উপন্যাসটি পড়ার তখনই তার কাছে মনে হবে কেবলমাত্র লেখা হয়েছে। পাঠকের আগ্রহকে গ্রাস করা উপন্যাসের বড়ো গুণ। তবে কেড়ে নিতে হবে বিদগ্ধ, শিল্পমূল্য সম্পর্কে সচেতন পাঠকের আগ্রহও। রিজিয়া রহমানের 'রক্তের অক্ষর' উপন্যাসটির সে গুণ আছে।

এ উপন্যাসটি মুক্তিযুদ্ধের ঘটনা সংবলিত নয়, এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম, হানাদারমুক্ত বাংলাদেশের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ভিত্তিক উপন্যাস। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধের পচন ধরেছিলো কিভাবে, ৩০ লাখ মানুষের তাজা রক্ত আর দু'লাখ মা-বোনের পবিত্র সম্ভম কিভাবে বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর মধ্যে ব্যর্থতার ট্র্যাজেডি তৈরী করেছিলো এ উপন্যাস তারই রক্তাক্ত দলিল। 'রক্তের অক্ষর' উপন্যাসে রিজিয়া রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের সামাজিক অধঃপতনের বিশ্বস্ত জীবনচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

এ উপন্যাসের পটভূমি ঢাকার একটি পতিতালয়। এখানে স্থান পেয়েছে ইয়াসমিন নামের তেজস্বী মেয়েটি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ইয়াসমিন তার মূল্যবান সতীত্ব হারিয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে হলে ইয়াসমীনের ভাই মারা যায়। ইয়াসমিনের ভইয়ের বন্ধু কামাল একজন মুক্তিযোদ্ধা। তাকে ইয়াসমিনরা বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছিলো বলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দেয় এবং ইয়াসমিনের মা-বাবাকে হত্যা করে। পশুরা ইয়াসমিনকে ধরে নিয়ে যায় তাদের ক্যাম্পে। বর্বোরোচিতভাবে ধর্ষণ করে। দীর্ঘ ছয় মাস মিলিটারী ক্যাম্পেই ইয়াসমিন অবরুদ্ধ ছিলো।

দেশ স্বাধীন হবার পর অন্যান্য সম্ভম খোয়ানো মেয়েদের সঙ্গে ইয়াসমিনও 'বীরাঙ্গনা রূপে সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রে জায়গা পেয়েছিলো। সেখানো নির্যাতিতা নারীদের আশ্রয় দেয়া হয়েছে। মায়ের বুকে যোদ্ধা সন্তান ফিরে এলো। মানুষের জীবন যাত্রার চাকা আবার স্বাভাবিক গতিতে ঘরলো। খবরের কাগজে নাম গোপন করে অনেক মর্মস্পর্শী রিপোর্ট ছাপা হয়েছে তাদের সম্পর্কে। দেশ স্বাধীন হবার পর ইয়াসমিনের খবর নেবার আর কেউ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে যে ছাত্রটি তার সঙ্গে প্রেম করেছিলো, তাকে নিয়ে রঙ্গিন স্বপ্ন দেখেছিলো, সেও করুনা করে বলেছিলো, "ওকে ভালো একটা বিয়ে দিয়ে দিন।"

আশ্রয় কেন্দ্র থেকে ইয়াসমিন গিয়েছিলো তার আপন চাচার কাছে, চাচার মুখটি স্বার্থপর পশুর আকার ধারণ করেছিলো। বলেছিলো, 'আমারতো ঘরে বড়ো মেয়ে রয়েছে। রিনা-তিনার বিয়ে দিতে হবে। শুধু আমার দোষ দেখছিস্ কেনো ? ষোলই ডিসেম্বরের পর তোর মামারাও তো বলেছিলো, "আমরা চাই যে ইয়াসমীন মরে যাক। ফিরে যেনো ওকে আসতে না হয়।"

আবার দয়া করে বিয়েও করেছিলো ইয়াসমীনকে একজন। সে ছিলো পাক হানাদার বাহিনীর চেয়েও পশু, বর্বর। সেই তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকটির আরো একটি সংসার ছিলো গ্রামে। ইয়াসমিনদের বাড়িটি দখল করাই ছিলো বিয়ে করার আসল উদ্দেশ্য। "তারপর ধরেছিলো আসল মূর্তি। ইয়াসমিনকে জোড় করে সে গলায় মদ ঢালিয়েছে। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এসে সারা রাত ধরে বিয়ে করা বউকে নিয়ে যৌথভাবে ফুর্তি করেছে।" এরপর ঐ পাক হানাদার বাহিনীর মতোই ঝাঁকে ঝাঁকে বর্বরতা চালিয়েছে, পয়সা-টাকা, ব্যবসা বাগিয়েছে ওই লোকটি। তারপর ইয়াসমিন ক্রুদ্ধ হয়ে পতিতালয়ে চলে আসে এবং বলে, "যুদ্ধ যদি আমাকে বেশ্যাই বনালো, তবে তার ফলভোগ ওই ক্রিম কাওয়া লোকদের করতে দেবো না। আমি বেশ্যা। আমি বেশ্যা হয়েই থাকবো।"

ইয়াসমিন গিয়েছিলো চাকুরীর খোঁজে। ইন্টারভিউতে 'বীরাঙ্গনা' পরিচয়ে উপস্থিত হতেই কর্তৃপক্ষ যেন চিড়িয়াখানার আজব পশু দেখতো। তাদের স্বাথান্ধ, অমানবিক, নষ্ট কৌতুহল দেখে ইয়াসমিন বলেছিলো, "পাকিস্তানি সৈন্যরা আমার দেহের ক্ষতি করেছে। আর আমার মনের ক্ষতি করছেন গৌরবান্বিত হওয়ার কথা, মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার কথা তার। তার কাছে সমগ্র জাতির নতজানু হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কথা। তা না হয়ে তার সম্ভম বিকানো স্বাধীনতার ক্রিম ভোগ করতে লাগলো লম্পট সুবিধাবাদিরা এবঙ

Dhaka University Institutional Repository

তাদেরই নির্দয়, লালসামত্ত আচরণ ইয়াসমিনদের মতো ধরে নারীদের পতিতালয়ে আশ্রয় নিত বাধ্য করলো। রিজিয়া রহমান ত্রিশ লাখ মানুষের এক সাগর রক্তে ভেজা সদ্য স্বাধীন দেশটিরসমাজের অভ্যন্তরে এমনভাবে তাকিয়েছেন যে তারআসল মূর্তিটি ছেঁকে এনেছেন। সমাজটি ছিলো অশোধিত। আমাদের দেশে সত্যিকার সামাজিক বিপ্লব হয়নি যাতে শোষক, কামুক, অসৎ পুঁজির মালিক ও অসৎ মোনাফা খোরদের নৈতিক চরিত্র শোধন হয় কিংবা নিশ্চিহ্ন হয়। এমনি বৈষম্য বিদ্যমান অবস্থায় আপনারা। আপনাদের মতো মানুষেরা যারা কিছু না হারিয়ে স্বাধীনতার ফল ভোগ করছেন।"

মুক্তিযুদ্ধে সম্ভ্রম হারানো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া একটি মেয়ে। যে যুদ্ধে সর্বস্ব হারিয়েছে মা-ভাই-বোন-আপনজনসহ। সদ্য স্বাধীন দেশে সবচেয়ে বেশী আমাদের জীবনে যুদ্ধ এসেছিল। এ যুদ্ধে ত্যাগ স্বীকার করেছিলো অধিকাংশ সাধারণ মানুষ। আর ঘাপটি মেরেছিলো নৈতিকতাবর্জিত সম্ভ্রম হারানোর পরিনতি সুস্থ, সাম্য ও সফলতার দিকে এগুতে দেয়নি। ত্যাগের উদ্দেশ্যকে বিনাশ করেছে এরাই। করতে পেরেছে, কারণ নেতৃত্বদানকারীরা বিপ্লবী দৃষ্টি দিয়ে সুবিধাবাদিদের দমন করতে পারেনি। উল্টো সুবিধাবাদিরাই ত্যাগ স্বীকার কারীদের উৎখাত করেছে। হয়তো এ জন্যেই স্বাধীনতা পরবর্তীকালে আমাদের সমাজ চলে যাচ্ছিল জঘন্য ভন্ডামী আর নৈতিকতা বর্জিত লাম্পট্য আর অনিরুদ্ধ দুষ্কর্মের দিকে। ইয়াসমীন পতিতালয়ে বসে, তার মেধাবী চোখ,তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে সমাজরে ঘৃন্য ভন্ডামী দেখেছে। দেখেছে নির্জলা অপকর্ম। ইয়াসমিন তাই দেলোয়ার নামক এক হৃদয়বান যুবককে বলেছিলো, সমাজ কাদের নিয়ে ? যারা এখানে বেশ্যার ঘরে উত্তেজনা কিনতে আসে তারা কি বাইরের মানুষ ? যারা বেশী পয়সা নিয়ে সুন্দরী বেশ্যাদের গাড়ি চড়িয়ে এখান থেকে বাইরে নিয়ে যায় তারা সমাজের মানুষ নয় ? আর যারা আমাদের লাইসেন্স কেনার টাকা তোলে তারা এর সমাজের বাইরে ? সেই আয় সরকারি আয় হয়ে যায় যখন সবার পাতে পড়ে ?" ইয়াসমিন দেলোয়ারকে আরো বলেছিলো,

> রাজনীতিবিদরা অনেক গালভরা বক্তৃতা দেয় আমি জানি। ছাত্রজীবনে আমিও রাজনীতি করেছি এখন আমার হাসি পায়। খবরের কাগজে আপনাদের সরকারের বড়ো বড়ো রদবদলের কথা যখন পড়ি আমার হাসি পায়। বলতে পারেন আপনাদের যে সরকারই যখন দেশ শাসন করছেন এই সব পাড়ার মেয়েদের কথা তাদের মনে পড়েছে ? তারা কি একবারও করেছে এ দেশেরই মানুষ, যাদের একদিন স্বাধীন নাগরিক হিসেবে জন্ম হয়েছিলো তারা কি নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারের মধ্যদিয়ে কতগুলো নির্বোধ অসহায় পশুর মতো জীবন কাঁটাচ্ছে। তাদের বর্তমান যন্ত্রনার, তাদের ভবিষ্যত অন্ধকার। তাদের নিয়ে কে ভেবেছে ?

যৌবন বিগত হলে একজন পতিতার কি পরিণতি হয় তা রিজিয়া রহমান বড়ো দরদ দিয়ে, নিখুঁতভাবে দেখিয়েছেন। জাহানারা নামক পতিতার কান্নায় ফুটে উঠে সেই অমানবিক চিত্র। জাহানারা বর্ণনা দিচ্ছেন লেখিকা এভাবে, 'ময়না বুঝল জাহানারার নেশা চড়েছে কথা বলল না সে। আধ খাওয়া বোতলটা হাত দিয়ে সরিয়ে রেখে জাহানারা হঠাৎ এসে দু'হাতে ময়নাকে জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলো ময়নারে ! আমারে কেউ না কেউ একদিন মাইরা ফালাইব। খুন কইরা ফালাইব। ময়না ক'তুই আমারে হামলাইয়া থুবি ? ক'তুই ক ? ..... ময়নারে তুই আমারে ছাইড়া যাইস না ময়না। ময়না তুই 'ক' কি হইব আমার ? কি হইব ?'

এর বিপরীতে আছে কুসুম নামের মেয়েটি। যার যৌবনের উদগম ঘটেনি। অস্ফুটন্ত লতিকা। তাকেও দেহ নিয়ে দরোজায় দাঁড়াতে হয়। সে থাকে সর্বক্ষণ অসুস্থ্য। শরীরের তপ্তজ্বর আড়াল করে ছলনা করতে হয় লোক ধরতে। জীবন বাঁচাতে হবে, ঘর ভাড়া দিতে হবে, মালিকের পাওনা শোধ করতে হবে। একদিন কুসুম জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলো, মুখে গলগল রক্ত উঠছিলো, তবুও ওর মালিক হিরুগুন্ডা লোক এনছিল ওর অপুষ্ট, অসুস্থ দেহটি ভোগ করার জন্যে। ওকে চিকিৎসা করে বাঁচাতে চেয়েছিলো সেই হৃদয়বান যুবকটি। নাম দেলোয়ার। সাংবাদিক লেখক। ইয়াসমিনের কাছেই আসতো গল্প করতে। চেয়েছিলো ইয়াসমিনকে উদ্ধার করতে, পারেনি। সমাজের অক্টোপাস থেকে নারীকে উদ্ধার করা অতো সহজ নয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইয়াসমিন নিরুচ্চারী নয়, প্রতিবাদী। সে রাজলক্ষী, সাবিত্রী নয় । সমাজ সচেতন। সমাজের পতন তাকে ব্যথিত করে। তাই মুক্তিযোদ্ধা কামালকে পতিতালয়ে দেখে দুঃখে দিশাহারা হয়ে বোতল ছুঁড়ে মাথা ফাঁটিয়ে দিয়েছিলো। কেনোনা কামালকে আশ্রয় দেবার কারণেই ইয়াসমিন পতিতা হয়েছে। একজন নৈতিক মুক্তিযোদ্ধার নৈতিক অধঃপতন ইয়াসমিন মেনে তিতে পারেনি। এতে তার মানবিক স্বদেশিক সত্তাটি খাঁটি স্বর্নের মতো উজ্জল হয়ে উঠেছে। ইয়াসমিন পতিতালয়ে থেকেও বই পড়তো, চীন-রাশিয়ার ইতিহাস পড়তো। খবরের কাগজ পড়তো। সে চেয়েছিলো দোলোয়ারের সাহায্যে পাড়ার অসহায় মেয়েদের সচেতন করতে। বলেছিলো, 'তোরাও মানুষ, তোদের মানুষের মতোই বাঁচতে হবে।'

হিরুগুন্ডা একটি নতুন অসহায়, অবুঝ মেয়েকে ধরে এনাছিলো। সে দেহ দিতে চায়নি। পশুরা জোর করে ওই মেয়েটির দেহ দখল করেছিলো। মেয়েটি অসহায় বোবার মতো চিৎকার দিয়ে আকাশ কাঁপিয়ে দিচ্ছিলো। ইয়াসমিন সহ্য করতে পারেনি। গিয়েছিলো প্রতিবাদ করতে। হিরুগুন্ডা তার ধারালো ছুটিটি ইয়াসমিনের পেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। রক্তে মেঝে সাঁতসেতে হয়েছিলো। ইয়াসমিনের হাতের বইটি চিত হয়ে পড়েছিলো। তার একটি পৃষ্ঠা ছিড়েঁ হিরুগুন্ডা রক্তাক্ত চাকুটি মুছে ছুঁড়ে মারলো। সেই পাতাটির অপর পীঠে লেখা ছিলো 'ম্যান ইজ বরন ফ্রি, বাট এভরি হোয়্যার ইজ ইন চেইন।'

দেশ মাতৃকার জন্যে যে মেয়েটি ইজ্জত বিকিয়ে দিয়েছিলো, সেই মেয়েটিই এক বর্বর, পাশবিকতার হিংস্র থাবা থেকে এক নারীকে বাঁচাতে গিয়ে বীরের মাতা জীবন উৎসর্গ করলো। ইয়াসমিনের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ, গভীর আত্মত্যাগ১৯৭১ সালে সম্ভ্রম হারানো মা-বোনদের ত্যাগের বিশালতাকে মনে করিয়ে দেয়। রিজিয়া রহমান ইচ্ছে করলে দেলোয়ারকে আরো একটু সমৃদ্ধ করতে পারতেন। এ ছাড়া এ উপন্যাসের বর্ণনায় মননশীলতার পরিমান কম বলেই মনে হয়। এতটুকু অতৃপ্তিতে কিছুই আসে যায় না। এ উপন্যাসটি রিজিয়া রহমান মন-খুলে, অভিজ্ঞতার ভিতে দাঁড়িয়ে, সরল প্রাঞ্জল ভাষায় লিখেছেন। অযথা শ্রেনীতত্তের কচকচানিতে যানটি, দাঁত ভাঙ্গা নিরীক্ষায় যাননি, অহেতুক কাউকে ছোটো বড়ো করতে যাননি, গদ্যের গড়নকে পেচা পেচিতে ঠেলে দেননি।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫-০) মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এযাবৎ বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলো হচ্ছে --- 'নিষিদ্ধ লোবান' (১৯৮১), 'নীলদংশন' (১৯৮১), 'দ্বিতীয় দিনের কাহিনী', 'বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ' (১ম খন্ড,২য় খন্ড), 'ত্রাহি' এবং 'অন্তর্গত'।

তাঁর উপন্যাসের কোনো কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণী চরিত্রকে মধ্যবিত্ত মানসিকতা গ্রাস করতে পারেনি বলে, চরিত্রগুলো তাদের অস্তিত্বের সংকট জেনেও সে সংকট থেকে দূরে সরে আসেনি বলে বা সে সংকটে নিজেকে জড়িয়ে ফেলায় বা মাধ্যবিত্তের দোদুল্যমানতায় গা ভাসায়নি বলে চরিত্রগুলোকে অতিমাত্রিক মনে হয় এবং বাস্তবতার অস্তিত্ব নিয়ে ও প্রশ্ন ওঠে, সংশয় জাগে। সংশয় জাগাটাই স্বাভাবিক। কেননা -- তাঁর উপন্যাসগুলোর ঘটনা, চরিত্রের উপস্থাপনা, এবং নিরীক্ষা কখনো কখনো কারো কারো কাছে আপাতদৃষ্টিতে অতিমাত্রিক ও আবেগ উচ্ছ্বাসপূর্ণ মনে হয়। আবু হেনা মোস্তফা কামাল তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে মূল্যায়নধর্মী আলোচনা করতে গিয়ে তাই মন্তব্য করেছেন,

> তাঁর উপন্যাসের চরিত্র গুলোকে কখনো মনে হয় যতোটা অতিমাত্রিক ব্যক্তি হিসেবে, ততোটা স্ব শ্রেণীর সম্প্রসারণ হিসেবে নয়।

এ ব্যাপারে তিনি অবশ্য ভিন্নমত ও পোষণ করে বলেছেন,

> তবে এও সত্য শ্রেণীসংস্থা থেকে বিযুক্ত ব্যক্তির মধ্যে নিহিত বিপুল সম্ভাবনারও চিত্র পাওয়া যায় তাঁর উপন্যাসে।

সৈয়দ শামসুল হক তাঁর মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলোকে যেভাবে স্ব-শ্রেণী থেকে বিচ্ছিন্ন করে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ দাঁড় করিয়েছেন তাতে সাহসী শিল্পীরই পরিচয় দিয়েছেন। ডঃ সারোয়ার জাহান - এর ভাষায়,

> ম্যধবিত্ত মানুষও, স্ব শ্রেণীর সমাজভূমি থেকে নিজের শেকড় ছিড়ে গেলে কী অভাবিত মাত্রায় বেড়ে উঠতে পারে, মধ্যবিত্ত মানস সীমা অতিক্রম করে অসামান্য সম্ভাবনায় দীপ্তিমান হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত মেলে সৈয়দ শামসুল হকের 'নিষিদ্ধ লোবান' এবং 'নীল দংশন' উপন্যাস দুটিতে।.....বিলকিস এই অপমানের প্রতিবাদ জানায় অসম্ভব এবং অভাবনীয় এক প্রতিক্রিয়ায়, প্রতিশোধ নেয় আরো অসম্ভব পদ্ধতিতে 'মশালের মতো প্রজ্জ্বলিত সমস্ত শরীর দিয়ে'।..... শেষে অবিরত অমানবিক পীড়নে সে বিদ্রোহ করে নিজের অজান্তেই বেসরকারী অফিসের এক কেরানী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী করি কাজী ইসলাম হয়ে যায় - কঠোর কণ্ঠে বলে, "হ্যাঁ আমি কবিতা লিখতে চাই, তবে তোমাদের জন্য নয়।'

ব্যক্তির এবং সমাজের চিন্তা ও ধারণার মধ্যে কখনো সেতু গড়ে ওঠে বা কখনো বিরোধ বাধে। সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস গুলোর ব্যক্তি তার সামাজিক সংস্থান থেকে বিচ্যুত হয়েছে, ব্যক্তি আর সমাজের মধ্যে বিরোধের কারণেই তাছাড়া নিরন্তর পরীক্ষা প্রবণ সৈয়দ হক হয়তো এটি ভাল ভাবেই জানেন যে 'সাধারণ গল্প বা কাহিনী সাহিত্যের পর্যায়ে উঠতে গিয়ে বাধা হয়ে জটিলতার রূপ নেয়।' আর এই জটিলতার সঙ্গে আসে তীব্র অনুভূতি, আসে গভীর জীবনবোধ। তাছাড়াও তিনি তাঁর দার্শনিক প্রজ্ঞায় মনে করেন, মানুষ কখনো বড় তীব্র আলোকে ক্ষণকালের জন্য নিজের ভবিষ্যত দেখতে পায়। ফলে তাঁর উপন্যাস উপস্থাপনায় তিনি সম্ভবত স্বতন্ত্র পথ খোজেন মানুষের অন্তলোক যাত্রায়। আর এই প্রেক্ষিতে কাহিনী বা ঘটনা বা চরিত্র বর্ণনায় কখনো কখনো অতিরঞ্জন, অতি আবেগের বহিঃপ্রকাশ মনে হলেও গভীর জীবনবোধ ও মানুষের তীব্র অনুভূতির খবর যে আমরা পেয়ে যাই তাতে সংশয় থাকে না। তাঁর উপন্যাসগুলোর কাহিনী অনুধাবন করে তা আমরা অতি সহজেই বুঝতে পারবো।

সৈয়দ শামসুল হকের 'নীলদংশন'(১৯৮১) উপন্যাসে বোঝানো হয়েছে,সাতচল্লিশ সাল থেকে সত্তর সাল পর্যন্ত নামে একদেশ হলেও পাকিস্তানীরা যে এ দেশে অর্থাৎ বাংলাদেশে কেবল বিদেশী বা বহিরাগতই ছিল না। ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই

Dhaka University Institutional Repository

বিচ্ছিন্নতা ছিল একশত ভাগ তাই যুদ্ধ ও বিচ্ছেদ ছিল অনিবার্য। জনৈক নজরুলকে বিদ্রোহী কবি নজরুল ভেবে ধরে নিয়ে অত্যাচার, জিজ্ঞাসাবাদ ও তাকে দিয়ে কবিতা লেখানোর ব্যর্থ চেষ্টার মধ্যে দিয়ে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্টিত দুই পাকিস্তান যে যথার্থই দুই জাতির দুই দেশ ছিল তার প্রমাণ মেলে মুক্তিযুদ্ধের সময় এক কেরানী নজরুলকে বিদ্রোহী কবি মনে করে ধরে আনা হয়েছিল - বাঙ্গালীকে বিদ্রোহের প্রেরণা দেবার অপরাধে। মীরপুর ব্রীজের কাছে থেকে তাকে ধরে নিয়ে যায়। অন্য সকলকে ছেড়ে দেয়, কিন্তু নজরুলকে ছাড়ে না। ঐ পথ দিয়ে ঢাকা ছেড়ে নজরুল স্ত্রী, পুত্র-কন্যার কাছে জাফরগঞ্জে যাচ্ছিল। কেন তাকে বন্দী করা হয়েছে, সে নিজেও জানেনা। কিন্তু তার কাছে নজরুলের একটি কবিতার কাটিং ছিল। ২৫শে মার্চ কবিতাটি পত্রিকায় ছাপা হয়োছিল। সব কিছু তল্লাশি করে যখন কবিতাটি পায়, তখন তার নাম জিজ্ঞাসা করে। মাথামোটা পাকিস্তানী সৈনিকেরা তাকে বিদ্রোহী কবি ভেবে ধরে নিয়ে যায়। নজরুলের বাড়ী আগে বর্ধমানে ছিল, দেশ বিভাগের সময় ঢাকায় এসে বসবাস করে। নজরুলের বাবা কবি নজরুলের নাম অনুসারেই তার নাম রাখে নজরুল।

২৫শে মার্চ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে নজরুল কখন কোথায় গিয়েছে, কারসাথে কথা বলেছে সমস্ত কিছু তাকে জিজ্ঞেস করেছে। নীচের তলার ভাড়াটে বশীর সাহেবের সঙ্গে তার কি কথা হয়েছে, বশীর সাহেব কি বলেছে সব খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞেস করে। নজরুল ভেবেছে বশীর সাহেবের কথা বললেই বোধ হয় সে মুক্তি পেয়ে যাবে। তাই বলে,

> বশীর সাহেব বললেন, শেখ মুজিব এমন টাইট
> দিয়েছে যে, ইয়াহিয়া আজকেই ঘোষনা দিয়ে
> ক্ষমতা হাতে তুলে দিয়ে ল্যাজ গুটিয়ে রাওয়াল
> পিন্ডি ফিরে যাবে। জীবনে আর এ মুখো হবে না।

বশীরসাহেব সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু বলেছে। তাতেও কাজ হয়নি।

নজরুল যখন বুঝতে পেরেছে বর্বররা তাকে কবি নজরুল ভেবেছ তখন হেসে দিয়েছে। হাসতে হাসতেই বলেছে, "আপনারা খুব ভুল করেছেন দেখছি। বিদ্রোহী কবি বয়সে অনেক বড়। মাথাটাও খারাপ তাঁর। থাকেনও কলকাতায়। আমি সে লোক নই, কবি নই। সিপাইরা মস্ত বড় ভুল করেছে বুঝলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে তার গালে একটা চড় পড়ে। মনে হয় জলন্ত একটা মশাল কেউ তার মুখের ওপর চেপে ধরেছে। উত্তপ্ত অশ্রু ঠেলে ওঠে তার চোখে।

নজরুলকে দিয়ে একটা কবিতা লেখানোর জন্যে অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু নজরুলতো কবি নয়, কবিতা লিখবে কী করে। তার মনের অজান্তেই সালেহার মুখ ভেসে উঠে। সালেহাকে সে খুব ভালোবাসতো। কিন্তু কখনো মুখ ফুটে বলতে পারেনি। তার এ দঃসময়ে তাই ভাবে সালেহাকে নিয়ে কবিতা লেখা যায় কিনা।

খাকি পোষাক পড়া লোকদের কিল-ঘুষি খেয়েও নজরুল তার বিবেককে বিকিয়ে দিতে পারেনি। কঠিন শস্তির মুখেও সে বিবৃতিতে দস্তখত করেনি। ইচ্ছে করলেই কবি নজরুল হয়ে দস্তখত দিয়ে সে মুক্তি পেয়ে যেতো। কিন্তু সে তা করেনি,

> নজরুল জানে না কি করে এদের সে বোঝাবে। কিন্তু ওদের কথাতে সায় দিয়ে, বিবৃতিতে নিজেকে কবি নজরুল ইসলাম পরিচয় দিয়ে দস্তখত করে মুক্তি সে সহজেই পেতে পারে। তবু সে কেন দস্তখত করছে না? ভেতর থেকে কে তাকে নিষেধ করছে ? কে তাকে এই অত্যাচার সহ্য করবার ভয়াবহ শক্তি জোগাচ্ছে?

পাকিস্তানী সৈন্য বোকা হতে পারে, কিন্তু নজরুলতো মিথ্যে বলতে পারে না। ব্যথা-যন্ত্রনায় নজরুল বলেছে,

> আমাকে আপনারা মেরে ফেলুন
> আমাকে মেরে ফেলুন।

প্রচন্ড পিপাসায় নজরুল শুধু ছটফট করেছে। পানিও ঠিকমতো খেতে দেয়নি। এমনকি মুখের দু'পাশের রক্ত চোট পিপাসা নিবারণ করতে চেয়েছে। নজরুলকে পানি খাওয়ানোর একটা দৃশ্য পড়লে আমাদের বাঙালীর সবার হৃদয়ই কেঁদে উঠবে।

> তাকে কয়েকজন মিলে ঠেসে চিৎ করে রাখে মেঝের উপর।
> একজন মুখের ভেতর গুজে দেয় পাইপ।

Dhaka University Institutional Repository

নিঃসাড় পড়ে থাকে নজরুল। যেন সে একটা নাটকের মহড়া দিচ্ছে। অপেক্ষা করে সে মুখের ভেতরে পাইপ নিয়ে।

> হঠাৎ পানির তোড় শুরু হয়ে যায়। প্রবল বেগে পানি আসতে থাকে পাইপ দিয়ে। ভরে যায় তার মুখ, নামতে থাকে গলা দিয়ে। প্রাণপনে সে মুখ থেকে পাইপটা ফেলে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। ভয়াবহ একটা হিক্কা ওঠে তার। গলগল করে পেটের ভেতরে ঢুকতে থাকে পানি। ক্রমশ ফুলে উঠতে থাকে তার পেট।

এভাবে পানি খাওয়ানো বোধ করি কোন পশুর পক্ষেও সম্ভব নয়।

নজরুলের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে। ভাবে স্ত্রী কুমকুম তার দৃশ্য দেখে দরোজার কাছে মাথা রেখে কাঁদছে। আবার দূর থেকে তার ছেলে মেয়ের কণ্ঠ শুনতে পায়। তাদের দূরে সরে যেতে বলে।

শাস্তির শেষ পর্যায়েও তাকে একটি কবিতা লিখতে বলা হয়। তাহলেই সে মুক্তি পাবে। কিন্তু সে তো আর কবি নয়, একজন সাধারণ মানুষ। বিদ্রোহের কবিতা কি করে লিখবে। সে মনে করে কবিতা লিখতে পারলে সে বিদ্রোহের কবিতাই লিখতো এবং তা তাদের বিরুদ্ধে হতো। তাকে কবি নজরুল ভেবে শাস্তি দেয়া, আর তাকে দিয়ে একটি কবিতা লেখানোর ব্যর্থ চেষ্টায় বর্বররা হয়ে উঠে আরো হিংস্র। তাকে নিক্ষেপ করা হয় গর্তে, মাটির সোদা গন্ধে। এই উপন্যাসের পরিণতিতে শত নিপীড়ন সত্ত্বেও একটা ছাপোষা কেরানী নজরুল পাকিস্তানীদের বশতো স্বীকার করেনি, সে শেষ পর্যন্ত কবি নজরুলের মতোই বিদ্রোহী হয়ে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম শহীদ হয়। এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক দেখাতে চেয়েছেন দুইভাগে বিভক্ত পাকিস্তান আসলে কতো আলাদা ছিল অন্যথা পাকিস্তানীরা এক নিরীহ কেরানীকে শুধু নামের মিলের জন্যে কখনই বিদ্রোহী কবি মনে করতে পারতো না। পাকিস্তান একদেশ ও জাতি হলে এমন উদ্ভট ব্যাপার কখনও হতে পারতো না। পাকিস্তান যে একটা অলীক রাষ্ট্র ছিল 'নীলদংশন' উপন্যাসে তার স্বরূপ উৎঘাটিত ।

'নিষিদ্ধ লোবান' (১৯৮১) সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক আর একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস,এক নপুংসক পাকিস্তানী মেজরকে কিভাবে তার শিকার বিলকিস আক্ষরিক অর্থে চিতার আগুনে পুড়িয়ে মারল সে কাহিনী।

কাদের মাষ্টারের মেয়ে বিলকিস ঢাকা থেকে জলেশ্বরী যাওয়ার জন্যে রওয়ানা হয়। কিন্তু নবগ্রাম এসে ট্রেন থেমে যায়। বিলকিস, "কিন্তু সে ভালো করেই জানে, ফিরে যাওয়া নয়, জলেশ্বরীতেই তাকে যেতে হবে"। (পৃ;৭৮)

ট্রেন থামার পর থেকে সিরাজ নামের একটি ছেলে তাকে অনুসরণ করে। বিলকিস কাদের মাষ্টারের মেয়ে এ কথা ওরা বুঝতে পারে। মনসুর নামে এক মুক্তিযোদ্ধার কথায় সিরাজ বিলকিসকে সাহায্য করতে আসে এবং নিষেধ করে জলেশ্বরী যেতে। নিষেধ উপেক্ষা করেই বিলকিস জলেশ্বরী যাবে। তাই সিরাজও তার সাথে যায়। রেল লাইনের দু'ধারে জঙ্গলে, তারই মাঝ দিয়ে অতি সন্তর্পনে, বহু কষ্টে পায়ে হেঁটে তারা সন্ধ্যার সাথে সাথেই জলেশ্বরী পৌঁছে। সেদিন জলেশ্বরীতে ডিনামাইট ফাটে। পরিস্থিতি খারাপ জেনেও তারা জলেশ্বরী গিয়েছিল।

বিলকিসের স্বামী আলতাফ খবরের কাগজে চাকুরী করতো। পঁচিশে মার্চ রাতে মিলিটারীরা সেখানে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেদিন থেকেই আলতাফের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। বিলকিসের মনে নানা ভাবনার উদয় হয়।মনে করে হয়তো এই বুঝি আলতাফ আসবে। আবার সে যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্যে ইন্ডিয়া গেছে। বিলকিসের ধারণা এমনও হতে পারে, এখানে ওখানে যে মুক্তিযোদ্ধাদের কর্মকান্ডের কথা শোনা যায় তার কেউ একজন আলতাফ হতে পারে। বিলকিস এক বুক আশা নিয়ে নানা ভাবনার অবতারণা করে।

এদিকে বাড়ী এসেও কাউকে বিলকিস পায়না। আলেফ মোক্তারের কাছে শুনতে পায় তার ছোট ভাই খোকনকে মিলিটারীরা মেরে ফেলেছে। তখন সিরাজকে নিয়ে রাতেই

Dhaka University Institutional Repository

বাজারে যায় খোকনের লাশ কবর দেয়ার জন্যে। বিলকিস দেখিয়ে দিতে চায় ওরাও মানুষ। তাইতো সিরাজকে বলতে শোনা যায়,

> ধরা পড়তে চাই না, সিরাজ। আমরা ধরা পড়তে চাই না। ধরা না পড়ে, খোকাকে কবর দিয়ে, আমি দেখিয়ে দিতে চাই, খোকা মানুষ, খোকা পশু নয়, যে তার লাশ পড়ে থাকবে।

কিন্তু তা বুঝি আর হয়নি। খোকাকে না পেয়ে অন্য কয়েকটা লাশ ওরা কবর দেয়। পরের দিন বাজারের একটা পাটের গুদামের ভিতর লুকিয়ে থাকে। পরের রাতে খোকার লাশ ওরা ঠিকই পায়। অন্য লাশগুলোও কবর দেযার পরিকল্পনা ওদের ছিল। কিন্তু খোকার লাশ পাওয়ার পরেই ওরা ধরা পড়ে।

বিলকিস এমনই একজন বঙ্গনারী যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়ে ভাইয়ের লাশ খুঁজে বের করে তার কর্তব্য সে পালন করতে চেয়েছে। কিন্তু ধরা পড়ে মেজরের কাম লোলুপ দৃষ্টির কাছে, সেও হার মানেনি।

মেজর বিলকিসকে পাওয়ার জন্যে নানা কথাই বলেছিল যার মধ্য দিয়ে একাত্তরে বাংলাদেশ দখলকারী পাকিস্তানী সৈন্যদের মনস্তত্ব ও বিকৃত চেতনার পরিচয় পাওয়া যায়,

> ------তুমি আমাকে পছন্দ করবে । .. কেন করবে না ? আমার বীজ ভালো। আমার রক্ত শুদ্ধ। রমনী স্বয়ং উদ্যেগী হলে অবশ্যই আমাতে তৃপ্ত হতে পারবে। আমি কি তোমাকে আকৃষ্ট করি ? আমি তোমাকে সন্তান দিতে পারব। উত্তম বীজ উত্তম ফসল।তোমার সন্তান খাঁটি মুসলমান হবে, খোদার ওপর ঈমান রাখবে, আন্তরিক পাকিস্তানী হবে, চাওনা সেই সন্তান ? আমরা সেই সন্তান তোমাদের দিব, তোমাকে দিব, তোমার বোনকে দেব, তোমার মাকে দেব, যারা হিন্দু নয়, বিশ্বাসঘাতক নয়, অবাধ্য অবাধ্য নয়, আন্দোলন করে না, শ্লোগান দেয় না, কমিউনিষ্ট হয় না। জাতির এই খেদমত আমরা করতে এসেছি, তোমাদের রক্ত শুদ্ধ করে দিয়ে যাবো, ইসলামের নিশান উড়িয়ে যাবো। তোমরা কৃতজ্ঞ থাকবে, তোমরা আমাদের পথের দিকে তাকিয়ে থাকবে, তোমরা আমাদের সুললিত গান শোনাবে আমি শুনেছি, বাঙালীদের গানের গলা আছে ? আমি কি তোমাকেআকৃষ্ট করি ? পৃঃ ১৪৬।

বিলকিস শিক্ষিতা। তাই তার মাথায় এমন বুদ্ধি আসে যে সে মেজরকেও এমনি ছেড়ে দেবে না। সে নিজে আত্মাহুতি দেয়ার সময় মেজরকেও শেষ করে যাবে। সিরাজকে (প্রদীপ) চিতা দেয়ার কথা বলেছিল বিলকিস, "বিলকিস স্থির কণ্ঠে বলে, আগে আমার ভাইয়ের সৎকার করব" (পৃঃ ১৫১) এবং সেইসাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে মেজরকেও চিতার আগুনে পুড়াবে।

মেজরের অনুমতিক্রমে প্রদীপকে চিতায় দাহ করা হয় মেজরের সামনেই। পোড়া মাংসের গন্ধ তার পেটের ভেতর থেকে সব উল্টে আসতে চায়। আগুনের প্রবল হল্কা অনুভব করে। নাক-মুখ ঢাকবার চেষ্টা করে মেজর প্রাণপনে। বিলকিসকে আকর্ষণ করে ;

ঠিক তখন বিলকিস তাকে আলিঙ্গন করে। সে আলিঙ্গনে বিস্মিত হয়ে যায় মেজর। পর মুহূর্তেই বিস্ফোরিত দুই চোখে সে আবিস্কার করে, রমনী তাকে চিতার ওপর ঠেষে ধরেছে, রমনীর চুল ও পোষাকে আগুন ধরে যাচ্ছে, তার নিজের পিঠ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। রমনীকে সে ঠেলে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু রমনীকে আগুন দিয়ে নির্মিত বলে এখন তার মনে হয়। তার স্মরন হয়, মানুষ মাটি দিয়ে এবং শয়তান আগুন দিয়ে তৈরি। জাতিস্মর আতংকে সে শেষ বারের মতো শিউরে ওঠে। মশালের মত প্রজ্জলিত সমস্ত শরীর দিয়ে তাকে ঠেসে ধরে রাখে বিলকিস। পৃঃ ১৫৬

পাকিস্তানী মেজরকে নিয়ে বিলকিসের জলন্ত চিতায় জ্বলে পুড়ে মরার মধ্য দিয়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের বিশেষত বাঙালী মা বোনদের দৃঢ়চেতা ও তেজস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

সিরাজ চরিত্রটিও অত্যন্ত জীবন্ত। সিরাজের বয়স সতেরো আঠারো। তার বোনকে মিলিটারীরা মেরে ফেলে। বাবা-মা ছোট ভাইকে বিহারীরা খুন করে। সবকিছু হারিয়ে যাওয়া পর সিরাজ চেয়েছিল ইন্ডিয়া চলে যেতে। কিন্তু ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সে একা যেতে সাহস করেনি। এরপর তার নবগ্রামের এক বন্ধু জলেশ্বরী থেকে নবগ্রামে নিয়ে আসে। এখানে এসে সে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাজ করে।

সিরাজের প্রকৃত নাম শ্রী প্রদীপ কুমার বিশ্বাস, সে মিলিটারীদের কাছ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুসলমান নাম রাখে। কিন্তু বর্বর পাকিস্তানীরা তো ধর্ম-নির্বিশেষে সবাইকে খুন করেছে, অত্যাচার করেছে। সিরাজ নামেই বিলকিসের সাথে সে মিলিটারীদের কাছে ধরা পড়ে। তার উপর চালিয়েছে শারীরিক নির্যাতন। যখনবুঝতে পারে সে হিন্দু,তখন তাকে হত্যা করে। অবশ্য মুসলমান হলেও পশুদের হাত থেকে সিরাজ রক্ষা পেতো না।

সিরাজ ছিল দায়িত্বশীল। নিজের প্রাণ ভয় উপেক্ষা করে সে বিলকিসের পিছু নিয়েছে, তাকে সাহায্য করতে। বিলকিসদের বাড়ীতে থাকা নিরাপদ নয় বলে তাকে আলেফ মোক্তারের বাড়ীতে নিয়ে যায়। সিরাজের ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। সে জানে পালাবার জন্য নিরাপদ জায়গা হলো শত্রুর ঘাঁটি। তাই বিলকিসকে বলে,

> সিরাজ একটু চুপ করে থেকে বলে, এখানে যা লুট করবার সব নিয়ে গেছে। ঘরের ভেতর কেউ আসে না আর। তাই এখানে আপনাকে নিয়ে এলাম। এখানে ওরা আজ রাতে আর আসবে না। আর এলেও ভেতরে ঢুকবে না। জানেন তো, পালাবার সবচেয়ে ভালো জায়গা শত্রুর ঘাটির ভেতরে। পৃ: ১০২

সিরাজ বিলকিসকে বলেছিল,

> আছি ইন্ডিয়া যাইনি, এখানে থেকে এখানেই আবার আমি প্রদীপ হতে চাই। দিদি, আপনি বুঝতে পারেন আমার দুঃখ ? মা-বাবা-বোন, আমার নাম, আমার পরিচয় একটা মাত্র রাতে আমার সব কিছু হারিয়ে যাবার দুঃখ ? দিদি, আমাদের ধর্মে বলে, ধর্মই মানুষকে রক্ষা করে। কই আমার ধর্মতো আমাকে রক্ষা করতে পারল না। (পৃ: ১৩৩)

সিরাজের আক্ষেপ ছিল এইটা। তাকেও শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতে হলো মিলিটারীদের হাতে। বিলকিসের সাথে ধরা পড়ে প্রান দিয়ে সেতার দায়িত্ব শেষ করেছে।

এক সময় জাদরেল মোক্তার বলে যার প্রচুর খ্যাতি ছিল, মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনিও রক্ষা পাননি। নির্যাতন,অপমান করে তাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়েছে। অথচ এই আলেফ মোক্তারের কথাই বিলকিসের মনে পড়ে,

> এককালে জাদরেল বলে খ্যাতি ছিল তার। বৃটিশ আমলে মুসলিমলীগের স্থানীয় নেতা ছিলেন বিলকিসের এখনো মনে আছে। ভোটে জেতার পর, তার গলায় ফুলের মালা দিয়ে জলেশ্বরীতে মিছিল বেরিয়েছিল। (পৃ: ১০০)

অথচ এই আলেফ মোক্তারকে যুদ্ধের সময় বিহারীরা যা খুশী তাই করেছে। এক সময় যার গলায় ফুলের মালা শোভা পেতো। সেই গলায় জুতোর মালা পড়িয়ে সারা শহর ঘুরেছে বিহারীরা। সিরাজের মুখে শুনি,

> ... বাঙালীদের ভেতর পড়ে থাকে শুধু আলেফ মোক্তার। মিলিটারী আসবার পর বিহারীরা দলেবলে বেরোয়, প্রত্যেকটা বাড়ি ঢুকে তছনছ করে, লুট করে। একদল এসে দেখা যায় মোক্তার সাহেবের। তারপর অন্ধ দেখে বদমাশ গুলির ফূর্তি হয়। আলেফ মোক্তারের গলায় জুতোর মালা দিয়ে বুকের উপর জয়বাংলা নিশান লাগিয়ে কোমরে গরু বাধার দড়ি বেঁধে সারা শহর তাকে ঘুরিয়ে বেড়ায়। অন্ধ মানুষ, হাটতে পারে না, বার বার পড়ে যায়, বাঁশ দিয়ে খুটিয়ে তাকে খাড়া করে, লাথি মারে, টেনে নিয়ে বেড়ায়। তারপর ফিরিয়ে এনে একা বাড়িতে রেখে যায়। আবার পরের দিন তাকে নিয়ে বেরোয়, আবার সেই এক বৃত্তান্ত। (পৃ: ১০২)

আলেফ মোক্তারের মাতা একজন সম্মানী ব্যক্তির সাথে তারা পাগলের মতো আচরণ করেছে। মনে হয়েছে আলেফ মোক্তার যেন কাঠের পুতুল।

Dhaka University Institutional Repository

আলেফ মোক্তারকে অপদস্ত করা, সিরাজকে হত্যা করা এবং বিলকিস সিরাজের চিতার আগুনে পুড়ে আত্মাহুতি দেওয়ার সময় পাকিস্তানী মেজরকেও পুড়ে মারা ইত্যাদি এ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

'নিষিদ্ধ লোবান' উপন্যাসের পরিণতি হয়তো বাস্তব সম্মত নয় কিন্তু এ উপন্যাসের যে মর্মবাণী তা একাত্তরের বাংলাদেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

আমজাদ হোসেনের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

আমজাদ হোসেন (১৯৪২ - ০) কলম হাতে নিয়েছেন ছেলেবেলারআসরে, পঞ্চাশের গোড়াতে ক্যামেরায় লেখা শুরু করেছেন ষাটের দশকে - সব লেখাতেই তার কলম ভীষণ তীক্ষ্ণ বজ্রে চেরা আঁধারের মতো জীবন ও পরিবেশের, এমনকি সুনির্দিষ্ট সময়ের আলোছায়ার প্রানবন্ত ছবি খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর লেখাতে জটিল জীবন খুঁড়ে হৃদয় বিশ্লেষণে কঠিনে - কোমলে তার কলম শব্দ চয়নে অসম্ভব পরিমিতি বোধের পরিচয় দেয় মুক্তিযুদ্ধের এই উপন্যাসগুলোই তার বিভা ছড়ায় কথকতায় শব্দমালায়।

(মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৯৮ সাল)

তাঁর লেখা মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলি হচ্ছে -

১। 'অবেলায় অসময়' রচনাকাল - (১৯৭৪)
২। 'অস্থির পাখীরা' ,, - (১৯৭৬)
৩। 'যুদ্ধে যাবো' ,, - (১৯৯০)
৪। 'যুদ্ধ যাবার রাত্রি' ,, - (১৯৯১)

'অবেলায় অসময়' রচনাকাল - ১৯৭৪, স্বাভাবিক ভাবেই ১৯৭১ এর স্মৃতি অনেক বেশী জ্বলজ্বলে ও বাস্তব, উপন্যাসের শুরু,

> আজ ছ'দিন
> গোলাবারুদের প্রচন্ড শব্দে উড়ে গেছে এদেশের সমস্ত পাখী, বসতির ধুলোবালি কাদায় মানুষের চিহ্ন আছে শুধু, কিন্তু মানুষ নেই কোথাও। তারই পাড়ে পাড়ে, দীর্ঘ এক নদীতে, একটাই মাত্র নৌকা সাংঘাতিক সন্তর্পনে ভয়ে ভয়ে ছুপ ছুপ করে অগোচ্ছে। এইটুকু নৌকোর ভিতরে অনেকগুলো মানুষ। ঠাসাঠাসি। গিজগিজে। এর ভিতরেই সব হাঁটু ভেঙ্গে, মাথা গুঁজে, ঠেলে বসে আছে।
> এ দু'দিনেই মানুষগুলো বদলে গেছে অনেক। অনিদ্রা - অনাহারে সব বিবর্ন, হলদে হয়ে যাচ্ছে। চতুস্পদ জন্তুর মত হাত পা ভেঙ্গে পড়ে থাকতে থাকতে রক্তে ঝিম ধরে গেছে। কোমর টন্ টন্ করছে ব্যাথায়। উঠে দাঁড়িয়ে, একবার হাত-পার ছাড়ানোর মত শক্তিও নেই অনেকের। বিশেষ করেযারা প্রবীন, বৃদ্ধ। তাদের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এখন অবশ পঙ্গু রোগীর মত।

একটি নৌকোয় করে কিছু মানুষের দেশ ছেড়ে পালাবার কাহিনী, কারণ, 'নিজের গ্রাম বলতে এখন শুধু ভয়ংকর আকাশ ছোঁয়া, একটা আগুন, বিরাট একটা সবুজ তেপান্তর বোঝাই অজস্র ধোঁয়া। অসংখ্য কচি কচি সবুজ গাছ-গাছালি পোড়া পোড়া একটা গন্ধ। হাজার হাজার মানুষের দৌড়া-দৌড়ির একটা বিকট শব্দ। অসংখ্য আর্তনাদ, চীৎকার। বুট জুতার লাথি। বুকে বুকে বেয়োনেট মারার নৃশংসতা। তারপর মুহূর্তে মুহূর্তে লাখ লাখ গোলা-বারুদের আকাশ ফাটানো আওয়াজ।' আলী মাঝির নৌকোয় জীবনের জন্যে পলায়নপর মানুষের কথা 'অবেলায় অসময়' আর সে নৌকা পদীপথের দৃশ্য ?

> নৌকোটা আস্তে আস্তে, ঝোপঝাড় জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে বড় নদীরমুখে এসে থামলো খোলামেলা বড় নদীর ভেতরে এ সময় নৌকোটাবের করবে কিনা, ভাবছিল আলী মাঝি। হঠাৎ বড় নদীর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলো সবাই। খরস্রোতে, একটার পর একটা মৃতমানুষের লাশ ভেসে যাচ্ছে। হাড়ি-পাতিল, কলসী, পুরনো ছাতা, পায়ের খড়ম, সিথানের বালিশ, কাপড় জামা, প্লাষ্টিকের পুতুল, কোরান শরীফের ছেঁড়া পাতা। মাঝে মাঝে ভেসে যাচ্ছে। যেনটুকরো টুকরো হয়ে নদীর জলে ভেসে বেড়াচ্ছে এক একটি সংসার।

Dhaka University Institutional Repository

একাত্তরের গ্রাম বাংলার, নদী বাংলার দৃশ্য 'অবেলায় অসময়' উপন্যাস বিশস্ততার সঙ্গে অঙ্কিত।

আলী মাঝির নৌকো চলছে অজানার উদ্দেশ্যে। সবার ইচ্ছে বর্ডার পাড় হবে। কিন্তু আলী মাঝি নিজের গন্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছে নিজেকে। বর্ডারে যেতে হলে কোন দিকে যেতে হবে সে জানে না। তবুও তরি নৌকা চলছে। মিলিটারিরা সমস্ত গ্রাম-গঞ্জ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে, গুলি করে মানুষ হত্যা করেছে। যে যেখানে পেরেছে পালিয়েছে। কিছু মানুষ আশ্রয় নিয়েছে আলী মাঝির নৌকোয়। নৌকোর ভিতরে ঠাসাঠাসি সব মানুষ। এতটুকু জায়গা নেই ভিতরে।

এই নৌকোয় এসেছে এক নব দম্পতি। কাশেম ও সকিনা। ভালোবেসে বিয়ে করেছে। কিন্তু বিয়ের রাতেই সকিনার বুকে গুলি লেগেছে। ভালোবাসার স্পর্শ পাওয়ার আগেই চাড়তে হলো বাসর ঘর। সেই সকিনাকেই বুকের মাঝে জড়িয়ে রেখেছে কাশেম। সকিনা কাশেমকে সারাজীবন কাছে পাবার জন্য পালিয়ে এসে বিয়ে করেছে কাশেমকে। কাশেমের এক বন্ধুর বাড়ীতে বিয়ে হয়। বিয়ের রাতেই সকিনার বুক ঝাঝড়া হয়ে যায় গুলিতে। কাশেমের যেন বুক চিরে যায় সেই কথা ভেবে,

> ভীষন একটা যন্ত্রণা, কাশেমের বুকে হাড়ে হাড়ে, অসংখ্য তীরের মত বিদ্ধ হতে থাকে। আর শুধু একটা কথার ধ্বনিই, পাঁজরে পাজরে বারবার প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।
> 'ভেবেছিলাম বিয়েটা হয়ে যাক। দুদিন পরেই আত্মীয় স্বজন সবার কাছেই দুজনেই ক্ষমা চেয়ে নেবো। তারপরসুখী হবো। সারাজীবন আত্মীয় স্বজন সবাইকে নিয়ে আমি আর সকিনা সুখে থাকবো। কিন্তু ও যে সত্যি সত্যি পালিয়ে যাবে, তাতো, আমি জানতাম না। পৃ: ১১৮।

নৌকো থেকে সবাই যখন একটা গ্রামে এসেছিলো, তখন কাশেম গিয়েছিলো কবিরাজের সন্ধানে। কবিরাজকে না পেয়ে তার বাড়ীর আঙ্গিনায় থেকে গাদাফুলের পাতা এনেছিলো সকিনার জন্যে। নিজের পাঞ্জাবী ছিড়ে গুলিবিদ্ধ জায়গা ব্যান্ডেজ করে দেয়।

চর বাহাত্তর গ্রামে এক ডাক্তার কালীকিংকর বাবু সকিনার ক্ষত জায়গা ব্যান্ডেজ করে দিয়ে ঔষধ খাওয়ায়। তাতেও কাজ হয় না। আলী মাঝির নৌকোয় যখন মিলিটারীরা ওঠে,তখন সবাই পাটাতনের ভিতর পালিয়েছিল। সেখানেই সকিনার মৃত্যু হয়। প্রচন্ড দুঃখ বেদনায় কাশেম সকিনাকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে নিজেও এক সময় নদীতে ঝাঁপ দেয়। নৌকোয় কাশেমকে না দেখে সবাই পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখে ছোট একটা বৃত্তের মত মানুষ শুধু সাতরাচ্ছে আর কি যেন খঁজছে। আলী মাঝি নৌকো ঘুরাতে চেয়েছিলো, কিন্তু বৈধন বাধা দেয়। কারণ একজনের জন্য নৌকোর সবাই বিপদে পড়তে পারে। এভাবে এক নবদম্পতি চিরতরে হারিয়ে যায়।

আলী মাঝির নৌকোয় আরও এক দম্পতি ছিল নাম আদম ও হাওয়া। গ্রামে যখন মিলিটারীরা হামলা করে তখন দৌড়াদৌড়ি করার সময় পাঁচ মাসের ছেলে কোথায় পড়ে যায় হাওয়া বিবি বুঝতেই পারে না। তারপর এই নৌকোয় উঠার পার হাওয়া কেমন যেন উদাসীন হয়ে যায়। নৌকোর মধ্যে ছোট বাচ্চাগুলি যেন অস্থির হয়ে উঠেছে। দুধ নেই, খাবার নেই, শুধু পানি খাইয়ে রেখেছে। বাচ্চারা কান্নাকাটি শুরু করলে তাদের বাবা মা চড় থাপ্পড় মারে। এসব দেখে যেন মহিয়সী গড়িয়সী মার প্রান কেঁদে উঠে। তিন চারদিনতো বুক খোলাই ছিল, কে খাবে তার দুধ। তাই নৌকোর বাচ্চাদের তার দুধ খেতে দেয়। ব্রজরানীর শ্বশুর রামকৃষ্ণ বাবুতো হাওয়াকে দেবীর সাথে তুলনা করেছে -

> তুমি যা দিলে, তার কাছে ঐ পেতলের মূর্তি হেরে গেলো মা। দেবীর আসন তোমারই হওয়া উচিত। এতদিন যাবত মিলিটারীর ভয়ে ঐ যুগল মূর্তিকেআমি বুকের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তোমার মত স্বর্ণমলয়ীর কাছে সত্যি ওটা পেতল তাই ফেলে দিলাম। মা, মাগো বলেই প্রনাম করতে যাচ্ছিল হাওয়াকে। কিন্তু বাধা দিলো আদম। (অবেলায় অসময়-পৃ: ১১১)

Dhaka University Institutional Repository

বাচ্চারা খেতে খেতে ঘা হয়ে গেছে তার স্তনের বোঁটায়, তবুও খাওয়া থামায়নি।

'অবেলায় অসময়' উপন্যাসে আলী মাঝি প্রাণপন চেষ্টা করেছে নৌকোর ভিতর মানুষগুলোর প্রান বাঁচানোর জন্যে। নৌকো বাইতে বাইতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবুও তার নৌকো চলছেই। কারণ সে জানে গ্রামে ফিরে যেয়েও লাভ নেই,

> কিন্তু কতোক্ষন আর। কিছুক্ষন পরই আলী মাঝি ক্লান্ত হয়ে যায়। যন্ত্রনায় দুটি হাত যেন ছিড়ে যেতে চায়, শরীর থেকে। অসহ্য,অসহ্য লাগে সব। ইচ্ছে হয় বৈঠাছেড়ে নৌকা ফেলে, নদী সাঁতরে ফিরে যাই গ্রামে। কিন্তু সেই বাপ-মা,আত্মীয়-স্বজন, স্নেহ-ভালোবাসার নাড়ী-পোতা গ্রাম কী আর এখন গ্রাম আছে ?(অবেলায় অসময়)

তাছাড়া নৌকোর মানুষগুলোর জন্য আলী মাঝির ছিল বুক চেরা ভালোবাসা।

আলী মাঝি নদীর পর নদী এগিয়ে যাচ্ছে। হাত দুটিতে অসহ্য যন্ত্রনা। নৌকোর ভিতরগিজগিজে মানুষগুলোও একটানার ঠাসাঠাসি করে থেকে, অনাহারে, কষ্টে যেন অবশ হয়ে গেছে। এরই মাঝে আলী মাঝির মনে পড়ে মনের মানুষের কথা, ভালোবাসার কথা। মিলিটারীর ভয়ে সবাই পালাচ্ছে। আলী মাঝিও প্রানভয়ে ছুটাছুটি করেছে। এই দৌড়াদৌড়ির ফাঁকে সে ফাতেমাকে খুঁজেছে। কিন্তু ফাতেমার সন্ধান সে পায়নি।

সিঁড়ি বাঁধানো একটা পুরোনো ঘাটে আলী মাঝি তার নৌকা রেখেছিল। সবাইকে নিয়ে টিনের দোতলা বাড়ীতে উঠেছে। বৈধন আর আলী মাঝি হাটে গিয়েছিল খাবার আনার জন্যে। দোকান পাট বন্ধ ছিল। লুটতরাজ - এর মতো মনে হয় তাই আলী মাঝি তালা ভাঙ্গতে নিষেধ করেছিল। কিন্তু বৈধন ছিল একটু গোঁয়ার প্রকৃতির। তার অবস্থা দেখে আলী মাঝি আর প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু আলী মাঝি যখন বলেছে মিলিটারী কাছেই আছে তানা হলে গ্রাম থেকে লোকজন পালাবে কেন। তাই বৈধন নিঃশব্দে দোকান ভেঙ্গে ফেলে। দোকানে সবই ছিল। চাল-ডাল, নুন, তেল, চিনি, গুড়, বিস্কুট সব। ক্ষুধার্ত বৈধন এসব দেখে যেন পাগলের মতো হয়ে গেল। সবকিছু খাবলা খাবলা করে মুখে দেয়। বৈধন ছিল বেঁটে এবং কালচে। পাকাপোক্ত হাত পায়ের পেশী। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। চোখ দুটি পিটে। মাথা ভেতরে সব সময়ই মনে হয় একটু রাগ রাগ ভাব আছে। কিন্তু আলী যখন বৈধনকে বলে সকিনার কথা 'মেয়েটা বোধ হয় বাঁচবে না'। বৈধন তখন একটু বিরক্তির সুরেই বলে,

> বোধ হয় না ? যে শালা মিলিটারী গুলি মারছে ওকে একবার সাংঘাতিক একটা উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে থাকে বৈধন। ঠিক এই মুহূর্তেই আলী মাঝির মনে হয়, বৈধন একটা পাকা বেলের মত। উপরটা ভীষন শক্ত, ঠনঠনে। কিন্তু ভেতরটা বড় নরম। ছ'দিন পর, এই প্রথম যেন, বৈধনের চরিত্রটা একটু পরিস্কার হলো আলী মাঝির কাছে। (অবেলায় অসময়- পৃ: ১২১)

সবাই যখন নৌকার ভিতর থেকে থেকে হাঁফিয়ে উঠেছিল মাটিতে নামার জন্য তখন আলী মাঝি নৌকা ছেড়ে যেতে রাজী হয়নি। কারণ আলী মাঝির বাবার দেয়া এ নৌকা যেন ফাতেমার ভালোবাসার চেয়েও গভীর। এ নৌকার ভেতরেই সে বড় হয়েছে। আর এ ছোটখাটো গয়না নৌকা আছে বলেই ফাতেমার বাবা মেয়েকে আলীর কাছে বিয়ে দিবে বলে দিন তারিখ ঠিক করেছিল। গুলি খেয়ে মরলে ও সে নৌকা ছেড়ে যাবে না।

আলী মাঝি সবাইকে শিখিয়েছিল যেন মিলিটারী দেখলেই সবাই পাটাতনের নীচে পালায়। এছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। একদিন মিলিটারী নৌকায় এসে বসলে, পাটাতনের নীচের মানুষগুলোর জন্যে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। আলী মাঝি যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠতে চায়।

> বারজন মিলিটারী মারার শক্তি ওজন করেছে মনে মনে। এক বৈঠার ঘায়ে ক'জনের মাথা ফাটাতে পারবে, এক বাড়িতে ক'টা হাত ভাঙ্গা যাবে। পায়ের

Dhaka University Institutional Repository

কাছে যে দু'তিন জন, এক লাথিতে ওদেরকে পানিতে ফেলে দেয়া যাবে কিনা ? এক ঝাপ দিয়ে ওদের অস্ত্রগুলো হঠাৎ করে কেড়ে নেয়া যায় না ? আলী মাঝির মনের ভেতর টকেটা পাগলামী শুরু করেছে। শিরায় শিরায় রক্ত বাড়ি খেয়ে খেয়ে ঢেউ তুলছে। কখন যে কী করে ফেলবে, আলী মাঝি নিজেও তা বলতে পারছে না ? (অবেলায় অসময়- পৃ:১৪২)

আবার ভয় পাচ্ছে পাটাতনের নীচ থেকে কোন শব্দ এল সবাইকে মেরে ফেলবে। মিলিটারী নেমেও যাচ্ছে না। আলী মাঝি কান পেতে রেখেছে, ভয় শুধু ওরা বেঁচে আছে কিনা, একটু নিঃশ্বাসের শব্দ যদি শুনতে পায়। তাও শুনতে পায় না। মিলিটারীরা নেমে গেলে নিজের যতটুকু শক্তি আছে তা দিয়ে শত্রু সীমা অতিক্রম করে। পাটাতনের ভিতর থেকে তিনজনকে মৃত বের করে। পচা, সকিনা ও ছোট বাচ্চা বরকত। বাচ্চাটি চীৎকার করে উঠতে চেয়েছিল, কিন্তু বাচ্চাটির মা সবাইকে বাঁচানোর জন্য চিরতরে চীৎকার বন্ধ করে দিয়েছে।

আলী মাঝি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আলী মাঝি উপস্থিত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় মিলিটারীদের ভয়ে প্রান বাঁচানোর জন্যে কতগুলি মানুষ আলী মাঝির নৌকায় উঠেছিল, সেই মানুষগুলোকে নিয়েই উপন্যাসের ঘটনা প্রবর্তিত হয়েছে।

আমজাদ হোসেনের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস 'যুদ্ধ যাবার রাত্রি' রচনাকাল (১৯৯১), একাত্তরের মার্চ মাসের শেষ ক'দিন পাকিস্তান বাহিনীর সশস্ত্র অভিযানের শিকার ঢাকার একটি অঞ্চলের কয়েকটি পরিবারের কাহিনী, মুসলমান, বৌদ্ধ, হিন্দু তিন সম্প্রদায়ের পরিবার ও মানুষ কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে একই সঙ্গে রক্তাক্ত হয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল সে কাহিনী।

আমজাদ হোসেনের 'যুদ্ধ যাবার রাত্রির' ঘটনা দুই রাত দুই দিনের। ২৫ শে মার্চ থেকে কারফিউ তোলার আগ পর্যন্ত লেখক কিভাবে কাটিয়েছেন তাই তুলে ধরেছেন। এয়ারপোর্ট রোডের কাছেই লেখকের বাসা। বাসায় ছিল স্ত্রী রত্না, এক ছেলে, এক মেয়ে হিমু-শিমু, ভাই দীনু, বোন তুলি ও শ্যালিকা স্বপ্না।

যুদ্ধ শুরু হলে সবাইকে নিয়ে লেকক বাসার ভিতর একি বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে পড়েন। দিনে লেখক আওলাদ হোসেন মার্কেটে যেয়েও যেন যুদ্ধের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন। সবাই সবকিছু বেশী বেশী করে কেনাকাটা করছে। কেউ দামাদামী করছে না। তিনিও চাল, তেল, নুন কাঁচা বাজার এনেছিলেন।

দু'দিনে ঢাকা থেকে সবাই পালাচ্ছিল, অথচ লেখকের আধ-পাগলা খালতো ভাই ব্যাঙ্গা বাসায় উপস্থিত। অজ পাড়াগাঁ থেকে এসেছে শেখ মুজিবের পালাগান দেখতে 'অসহযোগ পালা' ব্যাথার কথা শুনে স্বাশী-স্ত্রীদুজনেইঅবাক হয়ে যায়। চার পাঁচজন এক সাথে এসেছে। বাকীরা শহর ঘুরে দেখতে গেছে। বেলে মাছের মতো বোকা ব্যাঙ্গা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের বক্তৃতা, অসহযোগ আন্দোলনকে ভেবেছে 'অসহযোগ পালা'।

ঢাকার অবস্থা খারাপ দেখে লেখক রাতেই দেশের বাড়ি চলে যেতে চেয়েছিল। রত্নার আপত্তির কারনে যাওয়া হয়নি। কারণ লেখকের একবোন ছেলে মেয়ে নিয়ে নওয়াবপুর থাকে। রত্নার মা একা নাখাল পাড়ায় বাবা গাইবান্ধায়। তাদের রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। তাই সিদ্ধান্ত নেয় পরের দিন ভোরে সবাইকে নিয়ে একসাথে যাবে। কিন্তু যাওয়া আর হয়না।রাতেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। কার্ফু জারি করা হয়।

রাতে শহরের নিস্তব্ধতা কাটিয়ে চারিদিকে শুধু শোনা গেছে দ্রিম,দ্রিম শব্দ। একটানা পাকিস্তানীদের ধ্বংসলীলা চলেছে। আওলাদ হোসেন মার্কেটটাও পুড়িয়ে দিয়েছে। অসংখ্য মানুষ মরেছে।

Dhaka University Institutional Repository

লেখকের ছোটভাই দীনু ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র ছিল। কিন্তু খুব ভীতু। সে ভয়ে বাথরুমে গিয়ে থেকেছে। গায়ে ছিল কম্বল, কানে রেডিও। সে ভয়ে কম্বল ভিজিয়েছে পশ্রাবে। অনেক সময় খুঁজে পাওয়া না গেলে দেকা গেছে সে বাথরুমেই চুপটি মেরে শুয়ে আছে। ভয়ে কতবার প্রশ্রাব করেছে তার হিসেব নেই। সে সব সময় আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতো। এতে নাকি আন্তরিকতা আছে। সে বলে ঃ

> আমার গেঁয়ো কথার স্বাদ সোয়াদই আলাদা। এসব আমার মাটির কথা এসব কথার ভেতরে আমার অজ পাড়াগাঁর সবুজ সবুজ গন্ধ আছে। ভাবী, আপনার এই শহরের টবে আমি গোলাপ হয়ে ফুটতে পারি। কিন্তু লাভ কি, আসলে তো আমি গাঁদা ফুল। অজ পাড়াগাঁর শীত বিকেলের অলংঙ্কার। (পৃ: ৮৪)

রত্নার ছোট বোন স্বপ্নার ভয়ে জ্বরই এসে গেছে। লেখকও তাঁর স্ত্রী রত্না কিংকর্তব্য বিমূঢ়। চারিদিকে গোলা বারুদের ধ্বংসাত্মক অবস্থা, লাশের গন্ধ সবকিছুতে সবাই আতংকিত। মোমের নিবু নিবু আলোতে রাত কাটিয়েছে। একটু শব্দ না করে থেকেছে। লেখকের বারান্দায় কিছু লোক আশ্রয় নিয়েছিল ঃ তারাও নিঃশব্দে বারান্দার লোকগুলোর জন্য রত্নার প্রান কেঁদে উঠে। তাদের খিচুড়ি ও এক কলস পানি দিয়েছে খাওয়ার জন্য। আবার লোকগুলি যাওয়ার সময় তাদের মধ্যে একজন হিন্দু লোক একটা লুঙ্গি চেয়েছিল, কারণ তার পড়নে ছিল ধূর্তি। রত্না ভালো একটা লুঙ্গি দিয়ে দেয় লোকটাকে। লেখকের ভাষায়,

> আগেই বলেছি রত্নার চরিত্র হলো কঠিনে কোমলে বাঁধা। রাগে যেমন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। কাছেই যাওয়া যায় না। আবার অঝোর ধারায় কাঁদতেও পারে। সহজে থামানো যায় না সে কান্না।
> .....
> সারাদিনই কেমন যেন ছটফট করেছে আটকে পড়া নিশ্চুপ এই মানুষগুলোর দুঃখ দেখে। বার বার উঁকি দিয়ে দেখেছে মানুষগুলোকে। ওদেরও সংসার আছে। ছেলেমেয়ে স্ত্রী বাবা মা আছে। অথচ মৃত্যুভয়ে, এই খাঁ খাঁ দুপুরে কী নিশ্চুপ হিম পড়ে আছে এই গলির ভেতরে। পৃ: ৪৬।

লেখক নিজেও দরদী, কোমল মনের অধিকারী। ছেলেবেলা প্রতিবেশী কেউ মারা গেলে তিনিও তাদের কান্না দেখে কেঁদে ফেলতেন। ভাত, তরকারী চুরি করে খাওয়াতেন না খাওয়া মানুষকে। ভয়াবহ যুদ্ধে মানুষের করুন অবস্থা, মৃত্যুচিত্র দেখে তাঁর প্রাণ ঢুকরে কেঁদে উঠেছিল।

লেখকের পাশের ফ্লাটে থাকতো বড়ুয়া ফ্যামিলি। ঐ ফ্ল্যাটের অভিভাবকের নাম ইন্দুভুষন বড়ুয়া, তার এক মেয়ে, তিন ছেলে। ইন্দুভূষন ডায়াবেটিকের রোগী। দেশের ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে তার শরীর ভীষন রকম খারাপ হয়ে যায়। শরীরে সুগারের পরিমান বেড়ে যায়। ইনসোলিন প্রয়োজন। তার স্ত্রী ঊষা স্বামীর অবস্থা খারাপ দেখে নিজেই ড্রেনে হামাগুড়ি দিয়ে চলে যায় ডঃ মোস্তফা জামানের বাসায়। রাস্তায় বিপদ হতে পারে জেনেও সে গিয়েছে। তিন চারটে ইনসোলিন পেয়েছিলেন। কিন্তু ফেরার পথে মেশিন গানের গুলিতে সে মারা যায়। কারফিউ ভেঙ্গে যাওয়ার পর তার দুই ছেলে পচা ড্রেনের মধ্যে খুঁজে পায় তাদের মায়ের মৃতদেহ। স্বামীর জন্য এত কষ্টে ইনসোলিন জোগাড় করতে পারলেও নিজে বাঁচতে পারলো না।

লেখকের ফ্ল্যাটের পূর্বদিকে দোতলা টিনের বাড়ীতে থাকতো হানিফ নামে এক কন্ট্রাকটর। তার কাজের মেয়ে আকলিমা ওয়াসার জলকল থেকে পানি নিতে এসে সেখানেই গুলিবিদ্ধ হয়। আর নীচে থাকতো সুনীল সাহা নামে এক ভদ্রলোক সুনীল সাহার তিন মেয়ে, দুই ছেলে। বড় মেয়ে সুজাতা, দেখতে লক্ষী সরস্বতীর মতো। নগ্ন, ভদ্র ও হাসি খুশী স্বভাবের মেয়ে। মিলিটারীরা একদিন সুজাতাদের বাসায় ঢুকে। ঘরের কোনায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ছিল। গুলি করে পতাকাটিকে ছিড়ে ফেলে। লাথি মেরে দরজা

Dhaka University Institutional Repository

ভেঙ্গে ঘরে যায়। সুনীল সাহার নাম জিগ্যেস করলে, প্রান বাঁচানোর জন্যে বলে রহমান। তাকে সুরা পড়তে বলে। রত্নারা সুজাতাকে সুরা ফাতিহা শিখিয়ে দিয়েছিল , লেখেও নিয়েছিল। ভয়ে সেই সুরই সুনীল বাবু উল্টা-পাল্টা করে বলেছেন। মিলিটারীরা সুটকেশ থেকে মা কালির ছবি বের করে। ঘরে ধূতি শাঁখা সিঁদুর সবই পেয়েছিল। সবাই ব্রাশ ফায়ারে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু একজন আর্মির নজর পড়ে সুজাতার দিকে। বলে,

> তোমরাতো সবাই মারা যাবে। আর যদি বাঁচতে চাও, তাহলে এই মেয়েটাকে দাও। ওকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি তার বদলে তোমাদেরকে রেখে যাবো, কাউকেউ মারবো না।

মা, বাবা, ভাইবোন সবাইকে বাঁচানোর জন্যে সুজাতা আর্মিদের জীপে উঠে চলে যায়। হিন্দু মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী যাওযার আগে বাবা মার ঋন শোধ করার জন্য একটা রূপার টাকা দেয়। সুজাতা তাই তার বাবার হাতে রূপোর টাকা ও মা কালির ছবি প্রনাম করে তার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে চলে যায়। আর্মিদের কাছে কোন জাত ধর্ম ছিল না। সবাইকে তারা মেরেছে, সুন্দরী নারীদের ধরে নিয়ে গেছে।

কারফিউ তুলে নেওয়ার পর লেখকের এক সহকারী আর ছোট বোন জামাই আসে দুটো বেবী ট্যাক্সি নিয়ে। তাদের বাড়ি জিঞ্জিরা নিয়ে যাওয়ার জন্য। লেখকও রাজী হয়ে যায়। যাওয়ার সময় তার শাশুড়ীকেও নিয়ে যাবে। সবাইকে নিয়ে বেবী ট্যাক্সিতে উঠে। গলি ছেড়ে যাওয়ার আগেই লেখক দেখে দেয়াল ঘেষে এক লাশ পড়ে আছে এবং দেয়ালে রক্ত দিয়ে লেখা 'স্বাধীনতা জিন্দাবাদ'। এ দৃশ্য দেখে লেখক কেঁদে ফেলেছিল।

স্বাধীনতা ফিরে এসেছে, আমরা ফিরে এসেছে, আমরা পেয়েছি। কিন্তু বহু তাজা রক্তের বিনিময়ে। মা-বোনের ইজ্জত হারিয়ে। আমজাদ হোসেনের 'যুদ্ধ যাবার রাত্রি' উপন্যাসে লেখক যুদ্ধের প্রথম দু'দিন, দু'রাত কারফিউ চলাকালিন বাসায় বসে যা দেখেছেন, নিজের পরিবারে যে সব অবস্থা হয়েছে ভয়, আতংক সবই তুলে ধরেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সেলিনা হোসেনের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

সেলিনা হোসেন তাঁর 'হাঙ্গর নদী গ্রেনেড' মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বসে লিখেননি। পটভূমি মুক্তিযুদ্ধের সময়ের হলেও এর রচনাকাল ৪ এপ্রিল থেকে ১০ অক্টোবর ১৯৭৪। সেলিনা হোসেন যদিও মুক্তিযুদ্ধের অনেক পরে তাঁর স্বাধীন দেশের মাটিতে বসে উপন্যাসটি রচনা করেছেন, তবুও তাঁর নিরাসক্তি এবং জীবন সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অত্যন্ত প্রখর বলে উপন্যাসটিকে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের রচনা বলে মনে হয় এবং সেলিনা হোসেনের উপন্যাসটি প্রথম থেকে যে ভাবে শুরু হয়েছে তাতে সমগ্র উপন্যাসটির চরিত্রগুলো স্বাভাবিক অর্থে একজন মুনুষ যেভাবে পরিবেরে, পারিপার্শ্বিকতার মধ্যদিয়ে বেড়ে ওঠে, সেভাবেই চরিত্রগুলো বিস্মিত হয়েছে। কোনো আরোপিত চরিত্র এখানে নেই। উপন্যাসটি অর্ধেক পাঠ করার পরও মুক্তিযুদ্ধের কোন প্রসঙ্গ বা অনুসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে উপন্যাস পাঠে যতই সমাপ্তির পথে যাওয়া যাবে ততই অনুভূত হবে মুক্তিযুদ্ধের অনুসঙ্গ।

বুড়ি নামের মেয়েটি তার সংসারের বারজন ভাইবোনের মধ্যে বড় হতে থাকে কিছুটা আলাদা মাপের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে। লেখিকার ভাষায় বলা যায়,

> "হলদী গাঁর ছোট পরিসরে বুড়ি একটু বেশী এগিয়ে গিয়েছিলো। সমবয়সী খেলার সাথীরা যেমন ওর নাগাল পেতো না ওকে বুঝতে গিয়ে হিমশিম খেত-তেমনি বড়রা ওকে কাছে টানতে পারেনি।"

বুড়ির স্বভাবে ছিলো কিছুটা দুরন্তপনা। প্রকৃতিকে জানা, দেখা এবং সীমাবদ্ধ গন্ডী থেকে বাইরে কোথাও ছুটে গিয়ে বেড়িয়ে আসতে তার মন সব সময় ব্যাকুল থাকতো। বুড়ি দেখতে চায় হলদী গাঁর বাইরের দুনিয়াটাকে। কিন্তু তারসে সাধ্য ছিলো না। বুড়ির কেবলই জানতে ইচ্ছে করে, 'খাল কোথায় শেষ হয়।' "পথ কোথায় ফুরিয়ে যায়।" তার নিত্য নতুন ভাবনার অন্ত ছিলো না, বুড়ির সাধথাকলেও সাধ্য কুলায়নি হলদী গাঁয়ের বাইরে কোথাও যাওয়ার। ঘটনাচক্রে চাচাতো ভাই বিপত্নীক গফুরের সাথে বুড়ির বিয়ে হয়। বুড়ির ইচ্ছে পূরণহয়নি। বুড়ি চেয়েছিলো হলদী গাঁয়ের বেড়িটা ভাঙ্গতে।

> নৌকার ছইয়ের ভেতর বসে ঘোমটার ফাঁকে বিমুগ্ধ দৃষ্টি ওকে স্বস্তি দেবে। কোনো অপরিচিত জনের লোম হাত বুড়ির জীবনের বাঁক বদলের মাইল ষ্টোন হয়ে দাঁড়ারে, কিন্তু কোন ইচ্ছেই পূরণ হয়নি ওর। ..... কারোদৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়ে নতুন করে দেখা হলো না। চাচাতো ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার ফলে উত্তরের ঘর থেকে দক্ষিনের ঘরে যাবার ছাড়পত্র পেয়েছিলো মাত্র।

গফুরের দুটি ছেলে ছয় বছরের সলীম এবং চার বছরের কলীমকে রেখে গফুরের স্ত্রী মারা গেলেও সে বিয়ে করে। বুড়ির বাবা জীবিত ছিলো না। ফলে বুড়িকে বাইরে বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবেনি কেউ। বুড়ি গফুরের সংসার এবং সলীম, কলীমকে পেয়েও কি যেন পায়নি প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করে। বিয়ের চার বছর পর সে অনুভব করে তার নিজস্ব একটা সন্তানের দরকার। কিন্তু গফুর এই প্রসঙ্গে টের পেয়ে যখন বলে ওঠে,

> তুই এত ব্যস্ত হয়েছিস্ কেনো বুড়ি ? ছেলে তো
> আমাদের রয়েছে। ওরা কি তোকে সুখ দেয় না ?

তখন বুড়ি অন্য দশজন রক্তমাংশের রমনীর মতোই জবাব দিয়েছে -- "দেয়, কিন্তু তেমন করে দেয় না। মাঝে মাঝে মনে হয় ওরা আমার কেউ না। এবার আমার নিজের চাই। নাতিছেঁড়া ধন চাই। আমার শরীরের ভেতর উথাল পাতাল চাই।"

সাতচল্লিশ-উত্তর আমরা পাকিস্তান রাষ্ট্র পেয়েছি বটে। ভারত পৃথক রাষ্ট্রে পরিনত হয়েছে সত্য কিন্তু আমরা কি আমাদের গন্ডীর বাইরে যেতে পেরেছি। স্বাধীন হয়েও পরাধীন থেকেছি। পাকিস্তানের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে পূর্ববাংলার মানুষের মনে স্বাধীনতার স্বপ্ন

Dhaka University Institutional Repository

উজ্জীবিত হলেও পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষ যেমন সাতচল্লিশ এর স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করতে পারেনি। বুড়িও যেনো তাই। এখানে বুড়ি যেন পূর্ববাংলার শাশ্বত মায়ের প্রতীকীরূপে পরিনতি লাভ করেছে।

জীবন যে রকম চলে, সে স্বাভাবিকতা হ্রাস পেয়ে ক্রমে বুড়ির জীবনে যেন অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করতে থাকে। বুড়ি ইচ্ছে করলেই একটি সন্তানের মা হতে পারে না। প্রকৃতির জটিল সহস্যে ঘেরা জন্ম মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে বুড়ি অজ্ঞাত। তাই সে একসময় তার ছোটবেলার সেই নমিতা এবং প্রিয় বৈরাগিনী নীতার পরামর্শক্রমে একটি নবজাতকের প্রত্যাশায় শ্রীনাইল ধামে যায়। ধামের প্রতিষ্ঠাতা কেশা বাবা সিদ্ধিপুরুষ। তার কাছে যে চায় তাই পায়। কিন্তু শ্রীনাইল দামে যাবার আরো চার বছর প্রতীক্ষার পর বুড়ির আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি ঘটে। তবে দুঃখজনক ঘটনা হলো দশ মাস দশ দিন পুরো হবারআগেই অর্থাৎ আট মাসের মাথায় যে সন্তানটি লাভ করে সে বোবা এবং কিছুটা পঙ্গুত্বের গ্লানি নিয়ে পৃথিবীর বুকে আসে। রইস নামের বুড়ির এই ছেলেছি নিয়ে বুড়ি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে ওঠে,

পঙ্গু ছেলে রইসকে বুকে ধরেই বুড়ি পড়তি বয়েসে পা বাড়ায়। কখনও কখনও তাকে তার বাল্য সখা জলিলের নস্টালজিয়া স্মৃতি খুব কাতর করে তোলে। এক সলীমকে বিয়ে করায়। গফুরও মৃত্যুবরন করে। সংসারের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় সলীম।সংসারের আকর্ষন বুড়ির শিথিল হয়ে আসে। সলীম গায়ের একজন মাতব্বর গোছের লোক হয়ে দাঁড়ায়। চেতনাগত দিক থেকে সে স্বদেশপ্রেমী। হলদী গাঁয়ের মঙ্গলকামী। তাদের কাচারী ঘরে সারাক্ষন লোকজনের আসা যাওয়া দেখে বুড়ির মনে ভাবনা জাগে কি হলো দেশটার। বুড়িরকাছে দেশ মানেই হলদি গাঁ। বুড়ি ভেবে এক সময় বলেও ওঠে।

> কৈ এত বছরের জীবনে হলদী গাঁ-র কিছু হয়েছে বলেতো মনে পড়ে না। তাই একদিন সে কলিমকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে কলমীরা যুদ্ধ করবে দেশ স্বাধীন করবে। স্বাধীনতা আবার কি ? কেন যুদ্ধ হবে ? এর জবাব বুড়ির জানা নেই। বুড়ি এতোসব বুঝেও না। তাই হলদী গাঁর অস্থিরতা দেখে সে গাছের শেষ মাথায় বড় শিমূল গাছের নিচে গিয়ে বসে। এবং ওখানে বসে সে লক্ষ্য করে হলদী গাঁ কেমনে জানি বদলে যাচ্ছে, পাড়ার ছেলেরা ডাঙ্গুলি আর মার্বেল খেলা ছেড়ে দিয়ে বড়দের মতো ভাবুক হয়ে উঠেছে, বন্দুক ছোড়া শিখেছে। আবার শিমুল গাছের দিকে তার হঠাৎ শিখছে। আবার শিমুল গাছের দিকে তার হঠাৎ মনে হয়, শিমুলের গোটা আচমকা ফেটে গিয়ে যেমন তুলোগুলো দিগ্বিদিক ছুটতে। থাকে তেমনি হয়েছে হলদী গাঁয়ের অবস্থা। গাঁয়ের মানুষগুলোর বুকের ভেতর জমিয়ে রাখা শিমুল বীজ ফাগুনের গরম বাতাসে আচমকা ফেটে গেছে। মানুষগুলো ছুটছে। ছুটছে একটা লক্ষ্যের দিকে। সে লক্ষ ঐ শিমুল তুলোর মত সাদা ধবধবে উজ্জল। শিমুলের লাল ফুলের বীজ থেকে যেন ঐ উজ্জ্বলতার জন্ম হয় এও তেমনি। রক্তলাল ফুলের মত মানুষগুলোর চেহারা এখন রক্তাক্ত। কেবল ফোটার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। পৃ: ৮২

বুড়িকে আমরা কাহিনীর শুরু থেকেই বিকশিত চরিত্র হিসেবে দেখি। যদিও এ বুড়ি অনেক কিছুই জানে না, বুঝে না। তবুও তার নিরেট মনটা অনবরত এক লক্ষ্য আবিস্কারে তৎপর রয়েছে। ফলে বুড়ি হলদী গাঁয় গরম পরিবেশ দেখে এক সময় ঠিকই আবিস্কার করে নেয়। এক পর্যায়ে সে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামের সাথেও পরিচিত হয়ে ওঠে। পরিচিত হয়ে ওঠে জয়বাংলা শ্লোগানের সাথে। বুড়ি হলদী গাঁর উত্তপ্ত পরিবেশের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছে বলেই সে পুত্রবধুর সাথে কথোপকথনের সময় বলতে পেরেছে --

> "জানিস রমিজা আমার জীবনে হলদী গাঁকে এমন গরম কোনদিন দেখিনি। রোদ তো নয় যেন গনগনে আগুনের হাঁপরের মুখটা কে খুলে দিয়ে রেখেছে। পৃঃ ৮৬

Dhaka University Institutional Repository

উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যদিয়েই হলদী গায়ে পাকিস্তানী সৈন্য নামে। ক্যাম্পে বসে। সলীম মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। বুড়ির বাল্যসখা জলিল ঢাকায় রিক্সা চালাতো। পাকিস্তানি সৈন্যরা বস্তিতে আগুন দেয়ার ফলে তার বাচ্চাসহ স্ত্রী আগুনে পুড়েছে। আরো অনেকে মরেছে। সে গ্রামে ফিরে আসে প্রতিশোধ স্পৃহায়। অংশ নেয় মুক্তিযুদ্ধে।

পাকিস্তানী সৈন্যরা অপারেশন চালায় বুড়ির বাড়ী। খুঁজে সলীমকে। সহযোগিতায় এগিয়ে আসে প্রতিবেশী মনসুর মেম্বার। মিলিটারী সলীমকে বাড়ীতে না পেয়ে বাড়ী তছনছ করে এবং কলীমকে ধরে নিয়ে যায়। বাড়ি থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় সলীমের বউ তার সন্তানটিসহ।

> কলীম মারপিট কায় যে ঘাড় সোঁজা করে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকু তার থাকে না। বুড়ি চোখের সামনে পাকিস্তানি নৈ্যদের দ্বারা পুত্রের উপর এই নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখে উচ্চারন করে "কলীম তার ঘাড়টা ঝুলে পড়েছে কেন ? দুই একবার আমর দিকে চোখ তুলে তাকা। সাহসী বারুদজ্বালা দৃষ্টি ছড়িয়ে দে হলদী গাঁয়ের বুকে। মুছে যাক মহামারী, ... হলদী গায়ের মাটি নতুন পলিমাটিতে
> ভরে উঠুক।" পৃ: ১১৫

কলীমের শেষ রক্ষা হয়নি। গুলী করে মেরে রেখে যায় উঠোনের মাঝখানে। এ গুলীর শব্দ বুড়ির হৃদয়ে বিধে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, যেনো লেখিকার ভাষায় বলা যায়-

> "বুড়ি দেখে কলীমের দেহ থেকে রক্তের স্রোত নেমেছে। গুচ্ছ গুচ্ছ শিমুলের ফুলের মত লাল। বুড়ির মনে হয় সমগ্র হলদে গাঁটা গুচ্ছ গুচ্ছ শিমুল হয়ে গেছে। শিমুলের সাঁকো পেরিয়েই হলদী গাঁ একমুঠো উজ্জ্বল তুলো হয়ে যাবে। ঐ আচমকা বুড়ির মনে হয় সলীমরা এ কথাইতো বলতো। হলদী গাঁয়ের লোকগুলোর চোখে মুখে এ স্বপ্নইতো ভাসতো। হ্যাঁ স্পষ্টভাবে মনে পড়ছে যে শব্দটা ওরা সারাদিন বলাবলি করতো তা ছিল স্বাধীনতা।" পৃ: ১১৮-১১৯

হলদী গাঁয়ে ফুলির মতো মেয়েরাও ধর্ষিতা হয়। পুড়িয়ে ফেলা হয় নমীতাদের বৈরাগ্য সাধনের আখড়া। পাকসেনারা অমুক বাড়ীর গরুটা, ছাগলটা, মুরগীটা ছিনিয়ে নিতে পর্যন্ত দ্বিধা করেনি। এই গাঁ থেকে রমজানের দুইছেলে হাফিজ ও কাদের যুদ্ধে যায়। যাবার আগে বুড়ির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেছে। হলদী গাঁ শত্রুমুক্ত করার প্রত্যয়ে একবার হাফিজ কাদেররা আক্রমন চালায় শত্রু শিবিরে। এই হামলার সময়ও বুড়ি প্রত্যাশা করে মুক্তিযোদ্ধারাহারতেপারে না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি মুক্তি বাহিনীর অনুকূলে থাকেনি। হাফিজ, কাদের ওরা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসে। গ্রামের কোথাও আশ্রয়ে নিরাপত্তা ও নিশ্চযতা না পেয়ে হাফিঝ ও কাদের দৌড়ে ওঠে বুড়ির ঘরে।

বুড়ি তাদের আশ্রয় প্রদান করে। কিন্তু পিছনেই সার্চলাইটসহ শত্রু পক্ষ ধাওয়া করে এবং এক সময় বুড়ির বাড়ীর উঠোনে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় বুড়িকে মনে হয় বিশাল অরন্যে সে একা।

একাকীত্বের মধ্য থেকেও বুড়ি হাফিজ আর কাদেরকে বাঁচানোর প্রত্যয়ে একাকী বলতে থাকে,

> "যে ছেলে জনযুদ্ধের অংশীদারী হতে পারে না, যে ছেলে ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারে না, তার বেঁচে থেকে লাভ কি ?কত হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে। রইসও যদি যায়। না, পরক্ষনে মনটা মাষড়ে পড়ে। রইস ছাড়া বুড়ির পৃথিবী অন্ধকার। সব হারিয়ে কেমন করে বাঁচবে।

কিন্তু সমস্ত ভাবনাকে ছাড়িয়ে যেন 'পরক্ষনেই বুড়ির চোখে ভাসে বুড়ি দেখতে পায় তার শৈশব, কৈশোর যৌবন বিরাট ক্যানভাস উদ্ভাসিত হচ্চে। হলদী গাঁ-র নেংটি পরা

Dhaka University Institutional Repository

মানুষগুলোও যেনো উঠে আসে তার চোখে। কারো পেটে খাবার নেই। কারো গায়ে কাপড় নেই।

বুড়ি কোনো প্রকার দ্বিধা না করে রইসকে ব্যবহার করার চিন্তা মাথায় নেয়। কোনো প্রকার দেরি না করে গুমন্ত রইসকে টেনে তুলে আনে বিচানা থেকে এবং বিচানা থেকে একটি এল এম. জি গুজে দেয় রইসের হাতে।

বুড়ির আশ্রিতা নিতা এ দৃশ্য দেখার পর পরই বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে রইসের হাত থেকে অস্ত্রটা কেড়ে নিতে চায়। কিন্তু বুড়ি নিতাকে বাঁধা দেয়। রইস ভীষন খুশতিে অস্ত্রটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে। নতুন জিনিস দেখে রইসের মুখে ঝিলিক ফোঁটে।

বুড়ির এ ছাড়া আর কিছুই উপায় ছিলো না। কেননা হাফিজ আর কাদেরকে যে ওর বাঁচাতে হবে। যে কোনো উপায়েই হোক না কেনো। ওরা যে হাজার হাজার কলীমের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিচ্ছে। ওরা যে হলদী গাঁয় স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবনকে উপেক্ষা করে লড়ছে। ওরা যে অচমকা ফেটে যাওয়া শিমুলের উজ্জ্বল ধবধবে তুলো। তাই নিজের স্বার্থটাকে সে বড় করে না দেখে, হলদী গাঁর স্বার্থটাকে বড় করে দেখেছে। সে ভেবেছে সে তো আর এখন কেবল রইসের মা নয়। বুড়ি এখন কসলের মা। সে যেনো হলদী গাঁর সকল সন্তানের মা। বাংলাদেশের মা।

বুড়ি রইসের মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এল.এম.জিটা রইসের হাতে গুঁজে দিয়েছে। সৈনিক ক'জন রইসের হাতে অস্ত্রটি দেখে খুবই খুশী হয়। আর সৈনিকরা ঘরে ঢুকে খোঁজার আগেই অস্ত্র হাতে ছেলেটাকে সৈনিকের সামনে বের করে দেয়ায় সৈনিকরা খুবই আনন্দিত হয়ে বুড়িকে একটা ধন্যবাদও জানায়।

কিন্তু সৈনিকরা কিছুতেই বুঝতে পারছে না যে কোথা দিয়ে কি হচ্ছে। বরং কোনো সন্দেহের অবকাশ না রেখে রইসকে লুফে নিয়ে সৈনিকরা চলে যায়। চলে যাবার সময় বুড়িকে ঠিকই অনুভব করে বুড়ির কলিজাটাকে খাবলে নিয়ে ওরা যেন চলে যাচ্ছে। কিন্তু না, সৈনিকরা রইসকে বেশী দূর পর্যন্ত নেয়নি। কলীমের লাগানো জামরুল গাছের নীচে রইসকে গুলী করে রেখে যায়। রইসের রক্তের স্রোতে গাড়য়ে জামরুল গাছের নীচের মাটিতে। রইসের এই মৃত্যু দেখে বুড়ির মনে হয়েছে বুকের ভেতরের পুলটা দুম করে ভেঙ্গে পড়েছে। আর রইস একটা টকটকে লাল তাজা বোমা।

বুড়ি তবুও ভেতর থেকে ভেঙ্গে পড়ে না। বাড়ীর সবাই যখন রইসের দিকে ছুটে যায় তখন বুড়ি দৌড়ে ঘরে আসে। ধানের মটকার মুখ খালি করে হাফিজ কাদেরকে বের করে আনে। ওদের দ্রুত পালাতে বলে বুড়ি। ওরা পালানোরসময় রইসের মৃতদেহ চোখের সামনে পড়ে এবং ধমকে দাঁড়ায়। ওরা ওদের এক চাচার কাছে সব শুনে বুড়ির কাছে ফিরে আসে। ওরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেও বুড়িকে বিব্রত করতে পারে না।

বুড়ির কণ্ঠে তখনও জোরালো ভাষা,

> "তোদের যে আরো লড়তে হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের চোখে পানি বেমানান। এখনও না পালালে তোরাও ধরা পড়বি। আর সময় নেই রে। তোরা যদি ধরা পড়িস বৃথাই রইস মরল। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়।" পৃ: ১৬০

বুড়ি নাড়ি ছেঁড়া ধনের খোঁজে এক সময় এতোই ব্যাকুল ছিলো যে, সে ব্যাকুলতাবুড়িকে তার আপন জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলো, হয়ে গিয়েছিলো সে প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন। কেননা, বুড়ি প্রকৃতির টানকে দারুনভাবে উপলব্দি করেছে। বাল্যসখা জলিলের হাত ধরে সে প্রকৃতির বুকে হাঁটার চেষ্টা করেছে। স্বপ্ন দেখেছে স্বামী গফুরের সাথে। মাছ ধরা উপলক্ষে কত সময়ই না ডিঙ্গিতে কাটিয়েছে।

প্রকৃতির উদাস করা আবহে বুড়ি ও একাত্ম হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটি সন্তানের প্রত্যাশায় সে চিত্তস্থিত হয়েছে। প্রকৃতিও পর হয়ে উঠেছে তার কাছে। হলদী গাঁর

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতাকে বুড়ির কাছে মনে হয়েছে নাড়ী ছেঁড়া ধনের মতোই। তাই সে একটি নির্মল ভোরের খোঁজে, কলমির মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহনের জন্য, হলদে গাঁ শত্রুমুক্ত করার জন্যে তার আরেক নাড়িছেঁড়া ধনকে বিসর্জন দিয়েছে।

> অপেক্ষায় থাকবো না। কৈশোরে, যৌবনে যে স্বপ্ন আমাকে তাড়িত করতো বার্ধক্যে সে স্বপ্ন আমি মুছে ফেলেছিলাম। এখানেই তার শেষ। পৃ: ১৬১

বুড়ির এ আত্মত্যাগ বাঙালির জাতীয় চৈতন্যের জাগরণকে উন্মোচিত করে। এ সময় হলদী গাঁর শুধু শান্তি কমিটির কিছু সমর্থক আর মনসুর মেম্বর ছাড়া সকল শ্রেনীর মানুষই শত্রু হননে এগিয়ে এসেছে। হয়তো তারা জানো না এ হনন কবে কখন শেষ হবে। তবু বাংলাদেশরুপী হলদী গাঁর মানুষ এবং বুড়ি আত্মত্যাগে হিয়ান হয়ে উঠেছে। তারা খঁজতে বেরিয়েছে নাড়ি ছেঁড়া এক নির্মল ভোরের খোঁজে। স্বাধীনতার অন্বিষ্টে। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে বুড়ির যে আত্মদ্যাগ সে সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিশ্বজিৎ ঘোষ তাঁর 'বাংলাদেশের সাহিত্য' গ্রন্থর 'বাংলাদেশের উপন্যাস' অধ্যায়ে যথার্থই বলেছেন যে,

উপন্যাসের নায়িকা বুড়ি মুক্তিযুদ্ধে উৎসর্গ করেছে প্রাণ প্রতিম সন্তানকে, এবং এভাবেই সে আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে পৌঁছে গেছে জাতিয় মুক্তি সংগ্রামের রক্তিম স্রোতে। হলদী গাঁয়ের নিস্তরঙ্গ জীবন ধারায় বেড়ে ওঠা বুড়ি মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্রোতে অবগাহন করে হয়ে ওঠে সূর্য - প্রতিম। বুড়ির অপর নাম মুক্তির আকাঙ্খাও যেন হাজার লক্ষ সন্তানহারা গর্বিতা মাতৃভূমির শাশ্বত শিল্প-প্রতিমা। এক রইসের মা থেকে বুড়ির উজ্জল উত্তরণ ঘটে, ও হয়ে যায় লক্ষ রইসের সর্বজনীন মা।

Dhaka University Institutional Repository

রশীদ হায়দারের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

দেশের ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে সবাই যেন এক একটা খাঁচায় বন্দী। যে যেভাবে পেরেছে পালিয়ে থেকেছে। এ অবস্থার মধ্যেও দেশের দামাল ছেলেরা হায়েনাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। রশীদ হায়দারের (১৯৪১) 'খাঁচায়' (১৯৭৫) উপন্যাসটির কেন্দ্রিয় চরিত্র জাফর স্ত্রী লিলি ও একমাত্র কন্যা শর্মিষ্ঠাকে নিয়ে ভায়রার বাসায় এসেও বিভিন্ন সময় নানা উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় জাটিয়েছে। শুধু জাফর কেন এদশের সবার মনেই এই দুশ্চিন্তা ছিল। কখন যে পাকিস্তানীদের হাতে ধরা পড়তে হয়। জাফর অফিসে যায়, আবার অফিস থেকে বাসায় আসে। বাইরে নিরাপদে নয়, তাই বাসায় এসে কার্ড খেলে, আর বিভিন্ন খবর শুনে সময় কাটিয়ে দেয়। এর ব্যতিক্রম কখনো করেনি।

লিলির বড় বুবুর বাসায় একে একে সবাই আসে। লিলির একমাত্র ভাই বৌ, মেয়ে রওশন, ছোট দুটি মেয়ে শামসুল ও নাজমুন, মেজো ছেলে আতিক ও ছোট ছেলে তারেক। সাবই যেন খাঁচায় বন্দী।

জাফরের ছোট ভাই আবিদ, জাফরদের বাড়ীওয়ালার ছেলে লুৎফর মুক্তিবাহীনিতে যোগ দেয়। লুৎফর ঢাকার আশেপাশে, আর আবিদ বর্ডারে থেকে কাজ করেছে। লিলির ভাইয়ের ছেলে শফিক, মালেক ও মুক্তিবাহিনীতে। সবার কথা ভেবে জাফর নিজেকে খুব ছোট মনে করে। কারন সে মুক্তিবাহিনীতে যায়নি। অফিস আর বাসা ছাড়া জাফর আর কোথাও যায়নি। লিলির বড় ভাইকে প্রথমে দেখে জাফর ভেবেছে সে দালাল। পরেঅবশ্য জাফরের ভুল ভাঙ্গে। আবার যখন জানতে পারে তারই দুই ছেলে মুক্তিবাহিনীতে তখন তাকে নূতন করে আবিস্কার করে মুক্তিবাহিনীর জন্মদাতা গর্বিত পিতা বলে।

তিন তলার অধ্যাপক তাহের সাহেব ছিলেন নাস্তিক। যুদ্ধের ভয়াবহ দিনে তিনিও আল্লাহ্‌কে ডেকেছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি জাফরদের সাথে আলাপ আলোচনা করতেন, কার্ড খেলতেন, বিবিসি শুনতেন।

ঢাকা শহর চারিদিকে অবরুদ্ধ, কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। তাই জাফর ভাবে,

> রাস্তাঘাট সব বন্ধ। মহসীনের কথাটা সাপের মতো পেচাতে থাকে জাফরকে। এই যে সামনে দিয়ে খোলা মীরপুর রোড, উত্তর থেকে উত্তরে যাচ্ছে, কিন্তু জানে,আটকে গেছে মীরপুর ব্রীজের মুখে গিয়ে, সামনে, পিছে, মাশে রয়েছে উদ্যত ভয়াবহ সঙ্গীন। অথচ সেটা ছেড়ে যেতে পারলেই মুক্তি। প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে পারার পূর্ণ অধিকার। রায়ের বাজার পার হয়ে নদী অতিক্রম করে ওপারে যেতে পারলে চীৎকার করে বলা যায়, আমি আর পাকিস্তানীদের হাতের মুঠোয় নেই, যেখানকার মাটি পবিত্রতার সুবাস মেখে অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে যারা প্রতিটি মুহূর্তে অপেক্ষা করছে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে বলে। নারায়নগঞ্জ দিয়ে কোথাও চলে যাওয়া যায় না ?
>
> বাংলাদেশে কে এমন ব্যক্তি আছে যে এই খাঁচায় পোরা মানুষকে একটু আশ্রয় দিয়ে মুক্ত দিগন্তে চলাফেরা করার সুযোগ দেবে না।
> ওদিকে অবরুদ্ধ ? বনানী গুলশান হয়ে ? ক্যান্টনমেন্ট শিকারধরার জন্যে ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে ঃ এক খাঁচা থেকে আরেক খাঁচায়।

জাফর তার ভায়রার মীরপুরের বাড়ীতেই থেকে যায়। একদিন এক অপরিচিত লোক এসে জাফরকে সাবধান করে দিয়ে যায়। ক্লাশ ওয়ান অফিসারদের নাকি গবর্নর হাউসে রাও ফরমান আলীর কাছে যেতে বলা যায়। লোকটি হঠাৎ এসে কোথায় যেন মুহূর্তে চলে যায়। সবাই অবাক হয়ে যায়। জাফর খুব চিন্তায় পড়ে যায়। জাফর ছোটভাই আবিদের কথা মনে করে - সে-কি পারে না তাখে বাঁচতে ? কিন্তু আবিদ বেঁচে আছে কিনা সেটাও তার জানা নেই। বন্ধু-বান্ধবের কথা মনে হয় - যাকের, আতাউর, হায়াত,আনোয়ার। জাফরের মা শীর্ন শরীর নিয়ে দৌড়ুতে পেরেছিল কিনা। সাঈদ, করিদ, ফরিদা যদি স্বাধীন হয়ে থাকে, তবে হয়তো জয়বাংলা বলে চারিদিক কাঁপিয়ে তুলছে। বড়ভাইয়ের কথা মনে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

সমস্ত দ্বিধা,দ্বন্ধ, আশংকা কাটিয়ে অবশেষে দেশ স্বাধীন হয়। পাকিস্তানীরা আত্মসমর্পন করে। সমস্ত রাস্তা সাধারণ মানুষে ভরে যায়। মন্টু গলা ফাটিয়ে চীৎকার দেয় 'জয়বাংলা' বলে। বন্দী পাখীরা যেন মুক্তি পেয়ে রাস্তার দিকে ছুটতে থাকে। জাফর,মন্টু, আতিক, কামরুল সবাই নীচের দিকে চলে যায়। রাস্তায় নেমে 'জয়বাংলা' ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তোলে।

সারেন্ডারের খবর লিলির ভাই জানে না বলে সবাইকে উপরে আসে। যদি গুলি শুরু করে দেয় এই ভয়ে। কিন্তু আবার চারজন বেরিয়ে যায়। শেতাঙ্গ একজন ক্যামেরাম্যানের কাছে জানতে পারে জেনারেল নিয়াজী সারেন্ডার করেছে। চারিদিকে খুশীর বন্যা বয়ে যায়। জাফরের ছোটভাই আবদও ফিরে আসে। শেষের ক'দিন ঢাকায় থেকেই যুদ্ধ করেছে। মোশাররফ নরসিংদীতে ব্যাংক অপারেশন করে লাখ দশেক টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। লুৎফর মারা যায় ছাগল নাইয়া অপারেশনে।

স্বাধীন বাংলাদেশ। সবাই যেন মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে ছুটছে। জাফর খাঁচা খুলে দেয়। টিয়েটা কিছু দুর গিয়ে হঠাৎ যেন পড়ে যায়। কারন অনেকদিন বন্দী ছিল।

'অন্ধ কথামালায়' (১৯৮২) একজন স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধার মৃত্যু মুহূর্ত প্রতীক্ষায় দুর্বিসহ স্মৃতি ভারাকূল ও কল্পনা জাল বয়নে রুদ্ধশ্বাস আবেগতপ্তচিত্র অংকিত। বিশ্বাসী ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোকশেদএবং পাকসেনার তথাকথিত শান্তি কমিটির লোকের হাতে চোখ, হাত বাঁধা বেলালের আসন্ন মৃত্যু সম্ভাবনা তার সস্ত অনুভূতিকে এমন একাগ্র ও এক লক্ষ্যাভিমুখী করেছে যে, তারই টানে তার পূর্ব জীবনের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত স্মৃতি সূত্রগুলি অনিবার্য ভাবে এই সর্বগ্রাসী ভাবকেন্দ্রে সংহত হয়েছে। অবশ্য এর রচনাকাল মার্চ উনিশ শ' একাশি। পটভূমি একাত্তরের কালিপত্রের 'খাঁচায়' উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৭৩। তবে এর পটভূমি মুক্তিযুদ্ধের নয় াস। নয় মাসের ছিন্নভিন্ন সময়ের নিরাপত্তাহীন ঢাকার বাঙালী অস্তিত্ব যে চরম সংকটে এবং নাটকীয় ও সিনেমাটিক জীবন যাপন করেছে তা কথাশিল্পী রশীদ হায়দার তাঁর নিজস্ব পারিপার্শ্বিকতা দিয়ে চিত্রিত করেছেন। ঢাকার মিরপুরে তিনতলা বিশিষ্ট একটি বাড়ীর তিনটি ফ্ল্যাটের পরিবার পরিজন নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হলেও বাংলাদেশের যুদ্ধের ব্যাপক পটভূমির জীবনবোধের যে সমগ্রিকতা তা বিবৃত এখানে।

'অন্ধ কথা মালা', 'খাঁচায়' অবরুদ্ধ বাংলাদেশ একাত্তরের যে অন্তর্দাহ ও সন্তাপ তা প্রতিটি বঙালি মানসেই তথা জাতীয় জীবনেরই যেন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ তা 'জীবনার্থের শৈল্পিক প্রতিমান রূপে গড়া।

'নষ্ট জোছনায়' (১৯৮২) উপন্যাসটি স্বাধীনতা-উত্তর আট বছর পরের পটভূমিতে লেখা। তবে মাঝে মধ্যে ফ্লাশব্যাকের মাধ্যমে উপন্যাসের কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র, ভাষা, অব্যবহিত ভাবে উপন্যাসটিকে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়েছে। রুবী ভালবাসতো বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পড়ুয়া ডানপিটে কমল নামের এক ছাত্রকে। রুবীর ভালোবাসা নির্ভেজাল ছিলো। ছিলো একটা সুখের ঘর বাধার স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্ন গুড়িয়ে যায় একাত্তরের নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে। এ যুদ্ধে হারায় তার প্রেমিক পুরুষ মুক্তিযোদ্ধা কমলকে। কমলকে হারানোর বেদনা রুবীকে তিলে তিলে নষ্ট জোসনার দিকে টেনে নেয়।

রুবী কমলের জন্যে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার পর ও একটা প্রচন্ড আশাবাদ ব্যক্ত করে সে বেঁচে আছে - প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে আশার আলোক বুকে জ্বেলে। কিন্তু দুলু, মিজান, বেলটু, রবি ওরা বন্ধা সময়কে অতিক্রম করতে পারছে না, স্বাধীনতার অন্তর্দাহ ও সন্তাপের মধ্যদিয়ে খুঁজে পাচ্ছে না তাদের প্রত্যেকের ঠিকানা। জীবনবাদী ও ব্যক্তিত্বের তীক্ষ্ণ ও প্রখর অধ্যয়ন নেই বলেই সমকালীন জীর্নতাকে অতিক্রম করার চেতনা তাদের সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে স্বাধীনতা বিরোধী রিপোর্টার আওয়াল এবং তার বন্ধু মিল ম্যানেজার বদরুল পামার খপ্পরে পাড়ি জমিয়েছে। তাদের হুঁস হয় তখন, যখন, লেখকের ভাষায় বলা যায় - "স্বচ্ছ চাঁদের আলোয় দুলু স্পষ্ট দেখানো রুবীর ছোখের মনিকোটার থেকে বেরিয়ে আসছে, দেখলো সেই বিস্ফোরিত চোখের প্রতিটি শিরাউপশিরায় লেখা আছে, সময় আছে মামা, সুস্থ হও, এখনো সময় আছে। দোহাই তোমরা, জেগে ওঠো।"

Dhaka University Institutional Repository

এ উপন্যাসে সমাজ বাস্তবতার যে অভিজ্ঞতা সে অভিজ্ঞতাবোধ তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়েছে সাবুনামের মুক্তিযোদ্ধার প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়ায়। দুলু, মিজান ওরা সবাই জানে সাবুনামের মুক্তিযোদ্ধা বন্ধুটি প্রকৃত দেশপ্রেমিক। অথচ দেশপ্রেমিক হওয়ার পরেও অন্যায়ভাবে নিহত হয়েছে নব্য স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির চক্রান্ত শিকার হয়ে। তাও আবার ডাকাতির অভিযোগে। সাবুর উপর ডাকাতির অভিযোগ এনে আউয়াল নামের স্বাধীনতা বিরোধী রিপোর্টার পত্রিকায় খবর ছাপিয়েছে। "পুলিশের গুলিতে দুষ্কৃতিকারী নিহত। চারজন গ্রেফতার। প্রকাশ্য দিবালোকে ডাকাতির চেষ্টা।"

স্বাধীনতার প্রশ্নে স্বাধীনতা উত্তর পটভূমিতে রচিত এ উপন্যাসের অন্তর্দাহ ও সন্তাপের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া জাতীয় জীবনে, সমাজ জীবনে কিংবা পরিবার জীবনেও কোনরূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। অন্তর্দাহ ও সন্তাপ। খন্ডিত, কেবলমাত্র ব্যক্তিমনে তা ক্রিয়াশীল। পরিবার জীবনেও কোন ঘাত প্রতিঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি লেখক তা শিল্পীর দৃষ্টিতেই বিশ্লেষন করেছেন। এর জন্য দায়ী যেমনি সমাজ তেমনি সমসাময়িক দায়ম্পন্ন ব্যক্তির সাংগঠনিক অগ্রসরমানতা আমরা যেখানে লক্ষ্য করেছি স্বাধীনতা উত্তর সেখানে তা নিষ্ক্রিয়। এর দৃষ্টান্ত দুলু মামাদের মতো ব্যক্তিদের নাম অহরহ পাওয়া যায়। অবশ্য এটার মূল কারণও যে নেইতা নয়। আমরা জানি সমাজ সভ্যতার দ্বান্দ্বিক ক্রমাবিকাশের জাটিলতার প্রবাহ জাতির সম্মুখে নানা বিভ্রান্তি ও সংকটাকীর্ণ প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়।

স্বাধীনতা উত্তর সময়েও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে দুলু মামাদের মতো মুক্তিযোদ্ধারা ভুগেছে অস্তিত্বের সংকটে। নেমেছে তারা বিভ্রান্তির পথে। আসলে মধ্যবিত্তের শ্রেণীটাই যে অস্তিত্বের সংকটে দোলায়মান। এদের টিকে থাকাটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় সমাজ সভ্যতার বুকে।তবে স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি অস্তিত্বের প্রশ্নে যে ভাবে সংগঠিত থেকেছে সদা জাগ্রত, সামাজিকদায় সম্পন্ন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকামী ব্যক্তির ভূমিক সংগঠিত হতে পারেনি ততটা।

এ ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক রশীদ হায়দার 'কালজ্ঞান' সম্পন্নই বলা চলে।কেননা আমরা জানি উপন্যাস হলো জীবনার্থের শৈল্পিক রূপায়ন। তাছাড়া যুগধর্ম উপন্যাস শিল্পের বীজশক্তি। রশীদ হায়দার ইচ্ছে করলে মুক্তিযোদ্ধা মামা দুলুকে নীতিবাদী বানাতে পারতেন, তাহলে তা হতো কৃত্রিম চরিত্রের রূপায়ন। রুবী চরিত্রের মধ্যদিয়ে যেসামাজিক দায়বদ্ধতার কথা উঠে এসেছে তা হৃদয় থেকে উৎসারিত বাইরের নীতি আদর্শ বা উপন্যাসের তত্ত্বজ্ঞানেও সৃষ্ট নয়। রুবীর অন্ত-প্রকৃতি ও আত্মবোধের সমগ্রতায়তা সৃষ্ট। আমরা জানি উপন্রাস মানব-জীবনের ও সমাজ জীবনের অবিকল প্রতিরূপ নয়। তবুও তো এর মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকের একটা সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্ন থেকে যায়। ঔপন্যাসিক রশীদ হায়দার ও একজন সচেতন দায়বদ্ধ ঔপন্যাসিকের পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই। সে দায়বদ্ধতা উঠে এসেছে অস্তিত্বকামী ঘাত প্রতিঘাতময় মোট মানুষের জীবনকথায়। রুবী আপাত দৃষ্টিতে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে পরিচিত হলেও সে বিবেচিত অস্তিত্বকামী হিসেবে এবং তার মাধ্যমেই মোট মানুষের জীবনাগ্রহের, জীবন চলার পথ সন্ধানের ইঙ্গিত বিধৃত। তাছাড়া এ কান অরন্যের, হাতেম চরিত্রের ক্ষেত্রে উক্ত মন্তব্য গ্রহন যোগ্য। কেননা মুক্তিযোদ্ধা হাতেম একজন গাড়োয়ান, রাখাল শ্রেণীর তথা নিম্ন শ্রেণীর মানুষ, ব্রতিজ্যান।সেও ঘাত প্রতিঘাতময়ের শিকার কিন্তু অস্তিত্বকামী। ফলে স্বাধীনতা বিরোধী তসলিমারর বাবা ও দুলুর বাবার প্রতিকৃতির কথা স্মরণ করে ক্ষমা করতে পারেনি দুলুকে, দুলুর মাকে।

উপন্যাসের শেষ অংশে দেখতে পাওয়া যায় হাতেমের হাসির মাত্রা আরো বেড়ে যায় এবং বলে ওঠে "আমি ইচ্ছে করে তুমারে অন্য রাস্তায় লিয়ে আইছি।"

এই যে হাতেমের হাতে আবেদ আলীর বংশ খতম হচ্ছে - এখানেই নিহিত রশীদ হায়দারের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসের পরিণতি। যদিও তার অন্তর্দাহ ও সন্তাপ ক্রিয়াশীল হয়েছে উপন্যাসগুলোর বিশেষ চরিত্র ও ঘটনা প্রবাহ থেকে তবু এ কোন অরন্যের পরিনতি রশীদ হায়দারের উপন্যাসকে এনে দিয়েছে বিষয়ের সাথে প্রকরণের বিশিষ্টতা। কেননা রশীদ হায়দারের এ কোন অরন্যের বিষয়বস্তু নানান দৃষ্টিকোনে বিশ্লেষিত হতে পারে

Dhaka University Institutional Repository

সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যদি এর বিষয়ী বা বিষয়টির স্বরূপ খোঁজা যায় তাহলে দেখা যাবে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক ধরনের বৈপ্লবিক রূপান্তর লক্ষনীয়। যে রূপান্তর তাঁর উপন্যাসের প্রকরণগত দিকটির স্বরূপ নতুন মাত্রায় স্থান পায়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

হুমায়ুন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

হুমায়ুন আহমেদের (১৯৪৮-০) মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলো পাঠ করলে দেখতে পাই, তিনি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের রক্তাক্ত সময়ের চিত্র এমন ভাবেই তুলে ধরেছেন যে, সেখানে কেবল যুদ্ধকালীন দুর্গত বাংলাদেশের ছবিই নয়, পাশাপাশিপ্রত্যক্ষ করা যায় স্বপ্নময় ও নতুন মূল্যবোধের সাহসী ও প্রতিবাদী মানুষের মুখচ্ছবি। অবশ্য তাঁর উপন্যাসের সৃষ্ট সাহসী ও প্রতিবাদী মানুষগুলো কোন রাজনৈতিক ভাবাদেশ থেকে উঠে আসেনি। যদিও বাংলাদশের মুক্তিযুদ্ধের পেছনে আছে রাজনৈতিক ঘটনার ধারাবাহিকতা। আলোচ্য উপন্যাসের চরিত্রগুলোতে হুমায়ুন আহমেদের দৃষ্টিচেতনা বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনকরে মানবিক মূল্যবোধ থেকে। যা রাজনৈতিক শিল্প চেতনায় উত্তীর্ণ হয়ে যায়। 'সূর্যের দিন' মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাসসহ হুমায়ুন আহমেদ উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের সকালের বাস্তবকে তুলে ধরে লিখেছেন আরো ছয়টি উপন্যাস, উপন্যাসগুলো হচ্ছে 'শ্যামলা ছায়া'(১৪০০) 'নির্বাসন' 'সৌরভ' (১৯৮৪) 'আগুনের পরশমনি' (১৯৮৬), '১৯৭১' (১৯৯৫) 'অনিল বাগচীর একদিন' (১৯৯৬)। 'শ্যামল ছায়ার কাহিনীরপটভূমি খুব বিস্তৃত নয়। একটি থানা অপারেশনের কাহিনী নিয়ে এই উপন্যাস গড়ে উঠেছে। একটি রাতের কাহিনী। কয়েকজন তরুন গেরিলা এই অপারেশনে অঙ্গীনেয়। থানা অপারেশনের যাত্রাকালে জাফর, হুমায়ুন, হাসান আলী, মজিদ, আনিস প্রমুখের ভাবনা চিন্ত এবং যুদ্ধকালীন দুর্গত বাংলাদেশের চিত্র খন্ড খন্ড স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। বিস্তৃত হয়েছে তরুন গেরিলাদের দঃসাহসিক যুদ্ধযাত্রা। এই উপন্যাসের আরো একটি বিশেষ দিক লক্ষনীয় হচ্ছে কেরামত মওলা ও হাসান আলীর মতো দেশপ্রেমিক এবং সাহসী ও প্রতিবাদী রাজাকারের ও অভাব ছিল না।

হুমায়ুন আহমেদ দেখিয়েছেন এমন কিছু রাজাকার ছিলো যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করার জন্যেই রাজাকার নাম লেখায়নি। অভাবের তাড়নায় কেউ কেউ পা বাড়ায়েছিল সে পঙ্কিল পথে। যেমন লেখকের ভাষায় গ্রন্থর উদ্ধৃতি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়,

> চেয়ারম্যান সাব কইলেন, 'হাসান আলী রাজাকার হইয়া পড়। সত্তর টাকা মাস মাইনা, তার সাথে খোরাকি আর কাপড়। চেয়ারম্যান সাব আমার বাপের চেয়ে বেশি নেকবক্ত পরহেজগার লোক। তাঁর ঘরের খাইয়া এত বড় হইলাম। আমার চামড়া দিয়ে চেয়ারম্যান সাহেবের জুতা বানাইলেও ঋন শোধ হয়না। তাঁর কথা ফেলতে পারিনা। রাজাকার হইলাম। পৃ: ২৭।

এই সব রাজাকার আবার কখনো কখনো মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকায় অং নিয়েছে এবং মৃত্যুকে অকুতোভয়ে বরন করে নিয়েছে। হাসান আলীর অভিব্যক্তি থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হলো,

> মনডা খারাপ হইল। কামডা বোধ হয় ভুল হইল। তখনও আমরার গ্রামের মধ্যে রাজাকার -- দল হয় নাই আমরা হইলাম পরথম দল। সাতদিন হইল ট্রেনিং। লেফট রাইট, লেফট রাইট।.... মিলিটারী যা করে, তাই করি। নিজের হাতে আগুন লাগাইলাম সতীশ পালের বাড়ি, কানু চক্রবর্তীর বাড়ি। ..... ইস্ মনে উঠলেই কইলজাটা পুড়ায়। শেষ মেষ মিলিটারীরা শরাফত সাহেবের বড়ো পুলাডারে ধইরা আনল। আমার মাথায় গন্ডগোল হইয়া গেছে। সেই রাইতেই গেলাম মসজিদে। পাক কোরআন হাতে লইয়া কিরা কাটলাম এর শোধ তুলবাম। এর শোধ না তুললে আমার নাম হাসান আলি না। এর শোধ না তুললে আমি বাপের পুলা না। এর শোধ না তুললে আমি বেজন্মা কুত্তা।' পৃ: ২৮-২৯

বাঙালি ঔপনিবেশিক শাসকদের বৈষম্য বহুযুগ থেকেই দেখে এসেছে। পাকিস্তানি ঔপনিবেকি শাসকের অত্যাচারও দেখেছে। কিন্তু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সয় যে অত্যাচার,

Dhaka University Institutional Repository

অবিচার, গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছে তা এর আগে কখনও দেখেনি। ফলে যুদ্ধকালীন দুর্গত বাংলাদেশের -- মুখ দেখে যে, যে কোন বাঙালী প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে এটাই স্বাভাবিক। আর এই স্বাভাবিকতা হুমায়ুন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসে নতুন যাত্রা এনেছে সন্দেহ নেই। হুমায়ুন আহমেদের সাধারন চরিত্রগুলো বিদ্রোহী হয়ে উঠার পেছনে যে মানবিকতা বোধ কাজ করেছে এবং বৈষম্য থেকে প্রতিরোধের জন্ম দিয়েছে এরও একটা সাক্ষ্য মেলে হুমায়ুন আহমেদের জবানীতে 'আমার বাবা পুলিশ অফিসার ছিলেন। উনিশ শ' একাত্তর সনের পাঁচই মে তাঁকে দেশপ্রেমের অপরাধে পাক আর্মি গুলী করে হত্যা করে। সে সময় আমার ছোট ছোট ভাইবোনদের নিয়ে বরিশালের এক গ্রামে লুকিয়ে আছি। কী দুঃসহ দিনই না গিয়েছে। বুকের ভেতর কিলবিল করছে ঘৃনা, লকলক করছে প্রতিশোধের আগুন। স্বাধীনতা টাধীনতা কিছু নয়, শুদু ভেবেছি, যদি একবার রাইফেলের কালো নলের সামনে ওদের দাঁড় করাতে পারতাম।

ঠিক একই রকম ঘৃনা, প্রতিশোধ গ্রহনের একই রকম তীব্র আকাঙ্খা সেই অন্ধাকার দিনের অসংখ্য ছেলেকে দুঃসাহসিক করে তুলেছিল। তাদের যুদ্ধের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। না, কোনো সহায় সম্বল ছিল না। কিন্তু ছিল শ্যামল চায়ার জন্যে গাঢ় ভালোবাসা।

শ্যামল ছায়ার একজন মুক্তিযোদ্ধার জবানী থেকেও তা উপলব্ধি করা যায়। যেমন,

> যে জান্তব পশুশক্তির ভয়ে পরী ছোট ছোট পা ফেলে ত্রিশ মাইল হেঁটে গেছে আমার সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি তার বিরুদ্ধে। আমি রাজনীতি বুঝি না। স্বাধীনতা টাধীনতা নিয়ে সে রকম মাথাও ঘামাই না। শুধু বুঝি ওদের শিক্ষা দিতে হবে। পৃ: ২১

'আগুনের পরশমনি' (১৯৮৬) হুমায়ুন আহমেদের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে তৃতীয়। মতিন সাহবের বাড়ীতে একজন মুক্তিযোদ্ধা আসার কথা। সারাদিন সেই মুক্তিযোদ্ধারজন্য তিনি অপেক্ষা করেছেন। একথা তার স্ত্রীকেও বলেননি। একটা চাপা উৎকণ্ঠা তার ভিতর ছিল। বাহিরে গিয়ে হাঁটাহাটি করেছেন। সেলুনে গিয়ে চুল কেটেছেন সন্ধা ছ'টা থেকে কার্ফু শুরু তাই তিনি খুবই চিন্তিত। বাসায় এসে বারান্দায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থোকাচ্ছেন। কার্ফু শুরু হওয়ার আধা ঘন্টা বাকি তখন দোকানদার ইদ্রিস মিয়া বাসায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। কিন্তু সে সময় গলির ভিতর একটি লম্বা ছেলে ঢুকতেই তার ভাবভঙ্গি দেখে ইদ্রিস মিয়া বুঝতে পেরেছে সে মতিন সাহেবের বাড়ি খুঁজছে। ইদ্রিস মিয়া বাড়ী চিনিয়ে দিয়েছিল।

সেদিন ছিল ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের ৬ তারিখ। পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর কঠিন মুষ্টিতলে ঢাকার মানুষগুলি ছিল অসহায়, নিরূপায়। লোকটির নাম বদিউল আলম। তিনি গেরিলা অপারেশন চালানোর উদ্দেশ্যে সাতজন মিলে একটা ছোটদল বানিয়ে শহরে এসেছেন। মতিন সাহেবের বাসায় তিনি উঠেছেন। কিন্তু তার স্ত্রী সুরমা এর পক্ষপাত নন। তিনি বাসা থেকে চলে যেতে বলেন। ঘরে তার দুটি মেয়ে। এই দুর্দিনে যে কোন মুহূর্তে অঘটন ঘটতে পারে। এই আশংকায় না করেছেন। কিন্তু বদিউলআলম তার সিদ্ধান্তে অটল। তিনি জোড় গলায়ই বলেছেন তিনি এক সপ্তাহ থাকবেন। মতিন সাহেবের স্ত্রী পরে তাকে স্বাভাবিক ভাবেই মেনে নিয়েছেন।

আলমদের দলের একজন সাদেক। আলমের সাথে পরের দিনই দেখা করার কথা। কিন্তু আসেনি। আলমের ভয় সে দলের একজন ধরা পড়লে সবারই বিপদ। একন্ত জরুরী না হলে কেউ ঝিকাতলার বাসায় যেতে পারবে না। আলম সেখানে ও গিয়েছিল। এক মুহূর্তে বাইরে বাইরে আলম দেখেছে ঢাকা যেন বদলে গেছে। আগের মতো নেই। রাস্তার পাশে বইয়ের দোকান নেই, ভিক্ষুক গুলোকেও মনে হয় মেরে ফেলেছে। মেয়েগুলো বোরখা পড়ে বের হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

মতিন সাহেবের বাসায় আলমের কোন অসুবিদা হয়নি। আদর যত্নের চায়াতলে আলম ছিল। আলম মতিন সাহেব বলে ডাকতেন। এত মতিন সাহেবও অনেকটা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

মতিন সাহেবের দু'মেয়ে রাত্রি, অপলা মাঝে মাঝে ফুফুরবাড়ি গিয়ে বেড়ায়। ফুফুর কোন ছেলে মেয়ে ছিল না এজন্য ওদের প্রতি আন্তরিকতার একটু বেশীই ছিল। যুদ্ধের এ ভয়াবহ দিনে বিয়ের উপযোগী মেয়ে বিয়ে দেয়াটাই ভালো। তাই ফুফু রাত্রিকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। ফুফুর বাড়ী থেকে এসে রাত্রির মন খারাপ ছিল। এজন্য প্রথমে আলমের সাথেও পরিচিত হয়নি। পরে যখন বাবার মুখে শুনেছে আলম একজন মুক্তিযোদ্ধা, তাদের বাসায় কয়েকদিন থাকবে, গেরিলা অপরেশনের জন্য তারা এসেছে। আস্তে আস্তে আলমের প্রতি তার আগ্রহ বাড়তে থাকে। একজন দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা বলে মতিন সাহেবের বাসার সবাই আলমকে যেন হৃদয় দিয়ে মেনে নিয়েছিল।

মামা শরীফ সাহেবের ওখানে আলম যেতো বাসার খবর নিতে। শরীফ সাহেব ছিলেন সৎ চরিত্রের অধিকারী।লেখকের ভাষায় ঃ

> আলম হাসতে লাগল। এই মামার সঙ্গে তার খুবই ভাব। একজন সৎ এবং সত্যিকার অর্থে ভাল মানুষ। তার একটি মাত্র দোষ - উল্টো তর্ক করা আলমের সঙ্গে কতা বলতে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এই তিনিই আবার পাকিস্তানী ভাব আছে এমন কারোর সঙ্গে কথা বলবার সময় এমন যুক্তি দেবেন যাতে মনে হবে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে দেশ স্বাধীন হবে।(আগুনের পরশমনি)

মতিন সাহেবের বাসায় থাকার সময় যখন শেষ হয়ে যায়, তখন শরীফ সাহেবের কাছে থাকার কথা বলেছেন। শরীফ সাহেব তাতে রাজী হয়েছেন।

ঢাকায় আলদের প্রথম অপারেশনর দিন রহমানকে নিতে পারেনি। রহমান ছিল খুবই দক্ষ। অসুস্থ্য থাকার জন্য যেতে পারেনি। ওদের দল বায়তুল মোকাররমের ওখানে যেয়ে একভদ্র লোকের টয়োটা করোলা চায়। ভদ্রলোকটি যখন জানতে পারে এরা মুক্তিযুদ্ধের একটি গেলিলা ইউনিট তখন আর আপত্তি করে না। গাড়ির তেল কেনার জন্যও তাদেরকে টাকা দিতে চেয়েছে।

পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কুড়ি জনের একটি ইউনিট ফার্মগেটে ছিল। সেখানে এই গেরিলা দল প্রথম বিস্ফোরন ঘটায়। নিউ ইস্কাটন রোডে ওরা পাকিস্তানীদের মুখোমুখি হয়ে যায়। সেখানেই আলমের গায়ে গুলি লাগে। আশফাক আলমকে মতিন সাহেবের বাড়ি পৌছে দেয়ার পর সেও আমি ইন্টেলিজেন্সের কাছে ধরা পড়ে। গাড়িতেই দলের দুজন মারা যায়। আশফাককে মেজর রকিব অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে, কিন্তু কিছুই স্বীকার করে না। এরজন্য তার দুটি আঙ্গুল ভেঙ্গে দেয়। তারপরে মেজরকে দৃঢ়চিত্তে সে বলে, আমি আপনাকে কিছুই বলবো না।" কিছুই স্বীকার না করাতে পেরে মেজর আশফাককে গুলি করে মেরে ফেলার হুকুম দেয়।

আগুনের পরশমনি'র বিষয়বস্তু মূলত: মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় কয়েকজন যুবকের গেরিলা অপারেশনরে কাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগ ও শৌর্যকেঅসামান্য দক্ষাতার সঙ্গে এই মেদহীন উপন্যাসটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে। যে লক্ষ গ্রানের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা, তারই কয়েকটি অকুতোভয় ও তেজোময় প্রানের উষ্ণ স্পর্শ ছড়িয়ে আছে এই উপন্যাসের পরড়ে পরতে। আমাদের স্বাধীনতা সূর্যের আলোকপিয়াসী সেই অমৃতের সন্তানের এখানে তাদের কার্যক্রম ও হৃদয় অনুভবের এক আশ্চর্য উজ্জ্বল আল্পনা এঁকে রেখেছে। মুক্তির অগ্নিস্পর্শে দীক্ষিতহয়ে একদিন যারা খাঁটি সেনা হয়ে উঠেছিল 'আগুনের পরশমনি' বুকে ধারন করে আছে তাদেরই অমর গাঁথা।

একাত্তরের অবরুদ্ধ ঢাকা নগরীর অজস্র দিশেহারা ও অসহায় পরিবারের তোই একটি পরিবার হলো তিন সাহেবের পরিবার। স্ত্রী সুরমা, কন্যা রাত্রি ও অপলা এবং কাজের মেয়ে বিন্তিকে নিয়ে তার ছোট্ট সংসার। মতিন সাহেবের চাকরির উপরই

Dhaka University Institutional Repository

পরিবারটি নির্ভরশীল। তাই ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও তাকে অফিসে যেতে হয়। তবে অফিসের কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পেলেই মতিন সাহেব তার সহকর্মীদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য ও সম্ভাবনা নিয়ে আলাপচারিতায় মেতে উঠেন। তার সহকর্মীদের কাছ থেকে শুনে শুনে তিনিও মুক্তিযোদ্ধাদের 'আজদহা' নামে অভিহিত করেন। 'আজদহা' শব্দটির সঠিক অর্থ তিনি জানেন না। তবে এই শব্দের মধ্যে যেএকটা বীরত্বব্যঞ্জক ও বেপরোয়া ভাব আছে, তা তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে অত্যন্ত পছন্দ করেন। গভীর মনোযোগ দিয়ে তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বি,বি,সি ও রেডিও অষ্ট্রেলিয়ার সংবাদ শোনেন। কোন বেতার তরঙ্গ থেকে মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির সামান্য সংবাদ সংগ্রহ করতে পাললেই তিনি উৎসাহিত এবং আশান্বিত হয়ে ওঠেন। পিতার এই নির্ভত উল্লাসের একান্ত সঙ্গী তার বড় মেয়ে রাত্রি, যে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। তবে মতিন সাহেব শুধু নিরাপদ অবস্থানে বসেই মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন না। তার সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে প্রচন্ডভাবে আগ্রহী। আর এই আগ্রহের সূত্র ধরেই তার বাড়িতে এসে আশ্রয় নিয়েছে মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম। মতিন সাহেব বদিউল আলমের প্রকৃত পরিচয় প্রথমে তার স্ত্রীর কাছে গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমত্তার কাছে বরাবরই তিনি হার মানেন। এক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে বদিউল আলমের প্রকৃত পরিচয় যেমন সুরমা জেনে ফেলেছেন, তেমনি জেনেছে রাত্রিও। প্রথম চোটে খানিকটা বিরক্ত ও বিব্রত হলেও ধীরে ধীরে তারা সকলেই বদিউলকে পছন্দ করে ফেলেছে। কেননা বদিউল নিজেকে উৎসর্গ করেছে দেশের কাজে। দেশের প্রতি ভালবাসা বদিউলের রক্তে যেমন নাচন তোলে, তেমনি তিন সাহেব ও তার স্ত্রী কন্যার হৃদয়কেও সঞ্জারী সুর হয়ে তা অনুক্ষন বাজতে থাকে। তাই দেশের প্রতি বালোবাসার সূত্র ধরেই এই কয়টি মানুষ পরস্পরের খুব কাছে চলে আসে। মতিন সাহেবেরে বাসায় বদিউলের মোট এক সপ্তাহ অবস্থান করবার কথা। এর মধ্যে সে তার প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ঠিকানা বদল করবে। ভারত থেকে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে বদিউল তাঁর পাঁচজন যুদ্ধসঙ্গীসহ ঢাকায় ঢুকেছে। তার গেরিলা ইউনিটের সে-ই অধিনায়ক। অনেক নির্মোহ প্রকৃতির এবং ঠান্ডা মাথার মানুষ সে। দলের প্রতিটি সদস্যের উপরই সে আস্থাশীল। কেননা সে ভালো করেই জানে যে, যাদের নিয়ে সে যুদ্ধে নেমেছে, তাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষন এবং কাম্য দক্ষতা। তবে স্বভাবগত দিক থেকে তারা প্রত্যেকেই বেশ খানিকটা ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের এই ভিন্নতা তাদের সত্তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। তবে তাদের সমগ্র হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রেখেছে দেশ মাতৃকা। দেশকে হানাদারের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য তারা সকলেই দৃঢ় প্রত্যয়ী এবং উৎসর্গিত প্রান। তাদের এই অনুতোভয় অমলিন শুভ্র আকাঙ্খাকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই ভালবেসেছে তিন সাহেবের মতো ঢাকা শহরের প্রায় প্রতিটি বাঙালী পরিবার। দোকানদার ইদরিস মিয়া তাই নিজে উদ্যোগী হয়ে, বদিউল আলমকে মতিন সাহেবের বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছে। ডাক্তার ফারুক চৌধুরী হাসি মুখে আলমদের হাতে শুধু তার গাড়ির চাবিই তুলে দেননি, তেল কেনার টাকা দেবার জন্যও উদগ্রীব হয়েছেন। সরকারের উচ্চ পদস্থ চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও শরীফ সাহেব বিপদের সমূহ ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আলমকে সব রকম সাহায্য করতে উদ্যোগী হয়েছেন। আর এই সব বর্ধিত সাহায্য ও সহানুভূতির দৃশ্য পরম্পরাকে চিত্রিত করে ঔপন্যাসিক এই সত্যটিকেই স্পষ্ট করে তোলেন যে, ৭১-এর যুদ্ধ ছিল গোটা বাঙালী জাতির যুদ্ধ। এবং নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সমগ্র জাতিই এতে অংশগ্রহণ করেছিল। এর ব্যতিক্রম ও ছিল। তবে তারা সংখ্যায় এত অল্প ছিল যে বাঙালী জাতির প্রতিনিধিত্ব করার সামর্থ্য কিংবা অধিকার কোনটাই তাদের ছিল না। এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে তাই কোথাও তাদের কোন উজ্জ্বল অবস্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। ক্ষনকালের জন্য কোথাও কোথাও চোখে পড়ে বিয়ের বর ও যাত্রীদের - জাতির দুর্দিনে যাদের মনে তেমন কোন রেখাপাত করেছে বলে মনে হয় না। আবার রেডিওতে কান পাতলেও কখনো কখনো শোনা যায় ---- বাচ্চাদের অনুষ্ঠান হচ্ছে। "কিচির মিচির করছে একজন বাচ্চা। আপা আমি একটা ছড়া বলব। আমার নাম রুকসানা ..আপা আমার নাম সুমন। আমি একটা গান গাইবো। মতিন সাহেবের মতো দেশ দরদী ও সময় সচেতন মানুষ তখন স্বাভাবিক কারণেই এই কথা বলে গর্জে ওঠেন "এদের ধরে ধরে চাবকান উচিত। এ সময় গান হচ্ছে, ছড়া বলছে, কত বড় স্পর্ধা।"

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য এবং সকল ভয়কে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসে আলম, সাদেক, নূরু, রহমান, গৌরাঙ্গ ও আশফাকের মতো মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণেরা - দেশের স্বাধীনতাকে যারা জেনেছে আপন জীবনের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান। তাই দুর্ধর্ষ পাকিস্তানী বাহিনীর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে তারা সামান্য ক'টি অস্ত্র সম্বল করে। দুর্বিনীত মিলিটারী পুলিশকে তারা মুহূর্তের মধ্যে পরাজিত করেছে, বীর বিক্রমে আক্রমন চালিয়েছে ফার্মগেটের দুর্ভেদ্য মিলিটারী আস্তানায়। তাদের এই অর্বাচীন সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছে পাকিস্তানী বাহিনীর সুবেদার মেজর মাসুদ খাঁ স্বয়ং। কিন্তু সেই মুগ্ধতা তাকে ইউনিটসুদ্ধ নিয়ে গেছে মৃত্যুর পরপারে। যুগপৎ গ্রেনেড ও গুলির আগাতে বিপর্যস্ত হয়েছে তাদের খাঁটি, প্রচন্ড বিস্ফোরনের শব্দে কেঁপে উঠেছে অর্ধেক ঢাকা শহর। সেই শব্দের আতংক ও উল্লাসকে পিছে ফেলে তারা দ্রুত গতিতে এগিয়েছে হোটেল ইনটারকনের দিকে, যেখানে তখন অবস্থান করছে বিদেশী সাংবাদিকরা, সেখানে ও তারা সাফল্যের সঙ্গে ছড়িয়েছে শব্দের সাহসী সন্ত্রাস, এবং নিরাপদেই ফিরে গেছে আপন আপন আস্তানায়। তাদের এই আকস্মিক ও বেপরোয়া কার্যক্রমে নতুনভাবে প্রান ফিরে পেয়েছে মৃতপ্রায় ঢাকা নগরী। দৌর্দন্ত পাকিস্তানী দাপটকে যারা ভেবেছিল অমোচনীয় নিয়তি, নিজেদের ভেবেছিল, শৃঙ্খলিত অসহায় প্রাণী আত্মবিশ্বাসের এক নতুন বাতায়ন খুঁজে পেয়েছিল তারা। অসহ্য আনন্দ, উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠায় চোখে জল অঅসে রাত্রির স্নেহ আর তৃপ্তির অনাবিল সম্মোহন ছুঁয়ে যায় সুরমার হৃদয়কেও। উল্লাসে মুখর হয়ে ওঠেন মতিন সাহেব। একটি সফল অপারেশনের কৃতিত্ব প্রাজ্ঞ শফিক সাহেবকে একই সঙ্গে বেশ খানিকটা প্রসন্ন ও উৎকণ্ঠিত করে তোলে। তবে এই অপারেশনের অভিপ্রায়কে একটি তাগাদামুক্ত বাগানের রূপকের মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক অত্যন্ত শিল্প কুশলতার সঙ্গে চমৎকার ভাবে এখানে উপস্থাপন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন মতিন সাহেবের বাসার সামনের ছোট্ট সবজি বাগানটিতে দীর্ঘ দিনের অমনোযোগ আর অবহেলার কারনে বেশ কিছু আগাছা জন্মেছে। আলমদের অপারেশনের দিনটিতে তিনি পথে পাকিস্তানী মিলিশিয়াদের এক অভিনব অত্যাচারের দৃশ্য দেখে বেদনাহত মনে অফিসে না গিয়ে বাসায় ফিরে আসেন এবং বাগানের সকল আগাছা পরিষ্কাররের কাজে লেগে যান। সফল অপরেশন শেসে ক্লান্ত পায়ে আলম তার ঘরে ঢোকার পূর্বমুহূর্তে বারান্দায় থমকে দাঁড়ায় এবং দেখতে পায় মতিন সাহেব বাগানে কাজ করছেন। আগাছা পরিস্কার করেজায়গাটি এত সুন্দর করে ফেলেছেন - শুধু তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে। আলম তার গেলিলা বাহিনী নিয়ে যা করছিল, তা ছিল প্রকৃতপক্ষে আগাছা মুক্ত করারই এ মহতী কাজ যে আগাছাগুলো এই দেশের প্রান ঐশ্বর্য শুষে নিয়ে তাকে নি:স্ব ও নিষ্প্রান করে ফেলার অপচেষ্টায় মেতে উঠছিলো। মতিন সাহেব যখন তার বাগান থেকে আগাছা উপরিয়ে ফেলছেন, আলম ও তার যুদ্ধসঙ্গীরা তখন বুলেটের আঘাতে দেশকে আগাছামুক্ত করার আগ্রান চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রুপকের এই চাতুর্যময় ব্যবহারের মধ্য দিয়া হুমায়ুন আহমেদ এই উপন্যাসের শৈল্পিক সিদ্ধিকে যেমন সমৃদ্ধ করে তুলেছেন, তেমনি রক্ষা করেছেন তাকে পল্লব গ্রাহিতার হাত থেকেও।

যে ক'টি চরিত্রের সমাবেশে সম্পূর্ণতা পেয়েছ এই উপন্যাসরে আয়তন, অনায়াসেই তাদেরকে দ'টোভাগে ভাগ করা যায়। এর এক বাগে রয়েছে অবরুদ্ধ ঢাকা শহরের অসহায় নর রারী, যারা ঢাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়নি কিংবা যেতে পারেনি। যেমন - মতিন সাহেব, সুরমা, রাত্রি, অপলা, শরীফসাহেব, নাসিমা ইয়াদ সাহেব, আশফাক, ফারুক চৌধুরী। অপর ভাগে রয়েছে আলম, সাদেক, নুরু, রহমান, নাজমুল ও গৌরাঙ্গ - মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষন নিয়ে যারা সদ্য ঢাকা শহরে প্রবেশ করেছে। এই চরিত্রগুলোর মধ্যে মতিন সাহেবই এই উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করেআছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্র না হলেও তিনি এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র। শিশু সুলভ সারল্য, সততা ও স্বদেশপ্রেমের ওতজ্জল্যে তাঁর চরিত্রটি ঝলমলে। এক সাধারণ চাকরিজীবী তিনি। তবে আপন বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বকে তিনি কোথাও খর্ব করেন না। দেশকে ভালবাসেন তিনি। সেই সেঙ্গ ভালবাসেন দেশের মানুষকে। তাই মিলিশিয়াদের হাতে ধরা পড়া দুটি বালকের আশু পরিণতির কথা ভেবে তিনি ব্যথিত হয়ে ওঠেন। আবার যে মানুষের দেখতে পান দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধের ঘাটতি নিমিষেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তার ওপর। তাই অবরুদ্ধ শহরের বেতার কেন্দ্রে গিয়ে যারা কবিতা অঅবৃত্তি করে কিংবা গান গায়, তাদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ক্ষোভ জেগে ওটে তার মনে। মনের সাহস ও দৃঢ়তা বাড়ানোর জন্য মাঝে মধ্যেই তিনি পীর - ফকিরদের দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকান এবং মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

প্রচারিত সকল ধরনের গুজবে বিশ্বাস করেন। সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহন করবার মতো সামর্থ্য কিংবা বয়স কোনটাই তার নেই। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যে কো ভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে তিনি দারুনবাবে উৎসাহী। আর এ কারণেই বিপদের প্রচন্ত ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও গেরিলাযুদ্ধে আলমকে তিনি তার নিজের বাসায় জায়গা দিয়েছেন। নজর রেখেছেন তার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধাও নিরাপত্তার ওপর। আলমদের সফল অপারেশনের সংবাদ যখন বি,বি.সির মাধ্যমে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তিনি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠেছেন সমগ্র ব্রিটিশ জাতটার ওপরেই। সারল্যে তিনি শিশুর সমগোত্রীয়। মমতায় তিনি আজীবন একনিষ্ঠ। স্ত্রীকে খানিকটা সমীহ করে চলেন তিনি-নিজের শিশু সুলভ সারল্যের কারণেই। সন্তানদের ভালবাসেন তিনি হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ দিয়ে। উজাড় করে এবং একইভাবে ভালবাসেন - "এ দেশে এমন কেউ কি আছে, যে এই দেশকে তার বাবার চেয়ে বেশি ভালবাসে ?" রাত্রির এই ভাবনার মধ্যে দিয়েই ব্যক্ত হয়ে পড়েছে মতিন সাহেবের চরিত্রের সর্বাধিক ও মহিমাময় পরিচয়টি।

মতিন সাহেব যেখানে সংসার ও স্বাদেশকে একসূত্রে বেঁধেছেন, তার স্ত্রী সুরমা সেখানে শুধুমাত্র সংসার অন্ত:প্রাণ মহিলা হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। সুরমা তার সংসারের কর্ত্রী। সংসারের কল্যান কামনা ও কাজের মধ্যেই তিনি নিজেকে পুরোপুরিভাবে নিবেদিত রেখেছেন। মতিন সাহেবের সারল্যে প্রতি তার অশ্রদ্ধা নেই। তবে তিনি নিজে সর্বদা সতর্ক থাকতে পছন্দ করেন। তাই মতিন সাহেব তার কাছ থেকে কোন কিছুই আড়াল করতে পারেন না। পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবেই তিনি আলমকে প্রথমে সহজভাবে প্রহন করতে পারেননি। কিন্তু আলমের দৃঢ় ব্যক্তিত্ব, দেশপ্রেম এবং স্থির প্রত্যয় তাঁর আপাত-কঠিন সত্তায় ক্রিয়া করতে থাকে ধীরে ধীরে এবং তিনি নিজেও দ্রবীভূত হতে থাকেন এক অপত্য স্নেহ। বসবার ঘর থেকে তাই তিনি আলমকে আবার ভেতরের সুসজ্জিত শোবার ঘরে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। নজর রাখেন তার খাওয়া দাওয়ার ও বিশ্রামের প্রতি। এবং সেই সকালে আলম যখন অপারেশনে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, সুরমা হয়ে ওঠেন এক স্নেহ বিগলিত মমতাময়ী মা। উপন্যাসের এই অংশে এসে আমরা দেখতে পাই - "সুরমা বারান্দায় বসে ওজু করছিলেন। আলমকে বেরুতে দেখে বেশ অবাক হলেন। মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে পরিস্কার গলায় বললেন, রাতে ঘুম হয়নি ? তাঁর গলায় খানিকটা উদ্বেগ ছিল। আলমকে তা স্পর্শ করল। তবে শুধু উদ্ধেগকুল হয়েই তিনি সময় কাটাননি। জায়নামাজের বসে বিধাতার কাছে একাত্তভাবে আলমের সাফল্য প্রার্থনা করেছেন। ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন - 'সুরমা রাত্রিকে ডেকে তুললেন। সাধারণত "ফজরের নামাজ তিনি চট করে সেরে ফেলেন। কিন্তু আজ অনেক সময় নিলেন। কোথায় যেন পড়েছিলেন, নামাজের শেসে পার্থিব কিছু চাইতে নেই তাতে নামাজ নষ্ট হয়। কিন্তু আজ তিনি পার্থিব কিছু জিনিসই চাইলেন। অসখ্য বার বললেন, এই ছেলেটিকে নিরাপদে রাখ। ভাল রাখ। সে যেন সন্ধ্যাবেলা আবার ঘরে ফিরে আসে। হারিয়ে না যায়। সুরমার সেদিনের এই কল্যান কামনা ব্যর্থ হয়নি। আলম অক্ষত অবস্থায় ঘরে ফিরে এসেছে। তবে পরবর্তী দিনের অপারেশন থেকে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ফিরে সেছে। সুরমা তখন মায়ের পূর্ণমমতা ও অধিকার নিয়ে তার পাশে বসেছেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শুশ্রুষা চালিয়েছেন তাকে সুস্থ্য করে তোলবার জন্য। বাত্রি ধীরে ধীরে আলমের প্রতি অনুরক্তা হয়ে পড়ছিল - সুরমার তীক্ষ্ণ চোখে তা প্রথম থেকেই ধরা পড়েছিল। এর পরিনতি যে ভাল হবে না, তা তিনি বুঝেছিলেন। সেইজন্য অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মেয়েকে নিবৃত্ত করবার চেষ্ট চালাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন বুঝলেন, রাত্রির সমস্ত হৃদয় জুড়ে আলমের আসন পাতা হয়ে গেছে। তখন তিনি নিবিড় সহমর্মিতা নিয়ে মেয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন। পরম আশ্বাসের সুরে তাকে শুনিয়েছেন - "আমার মনে হয় ও সুস্থ্য হয়ে উফবে। দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পর আমি আলমের মার কাছে গিয়ে বলব চরম দুঃসময়ে আমরা আপনার ছেলের পাশে ছিলাম। তার উপর আমাদের দাবী আছে। এই ছেলেটিকে অঅপনি আমায় দিয়ে দিন।" সুরমার এই আশাবাদী উচ্চারন, তার স্নেহময়ী মাতৃসত্তাকেই প্রোজ্জ্বল করে তুলেছে।

তবে সুরমা কিংবা মতিন সাহেব নন, এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বদিউল আলম। নিজেকে সে সংক্ষেপে আলম নামে পরিচিত করতেই বেশী পছন্দ করে। স্বল্পবাক, স্থিরপ্রত্যয়ী ও ঠান্ডা মাথার মানুষ সে। ঢাকা শহরেই সে বড় হয়েছে। এই শহরের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ। ২৬ মার্চের সেনা আগ্রাসনের পর সে ঢাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

গেরিলা প্রশিক্ষন নিয়ে তিন মাস পর আবার সে তার এই প্রিয় শহরটিতে ফিরে এসেছে। নিরাপত্তা ও গোপনীয়তার প্রয়োজনেই সে আশ্রয় নিয়েছে অপরিচিত ও অনাত্মীয় মতিন সাহেবের বাসায়। তবে তার ব্যক্তিত্বের কারনেই কয়েকদিনের মধ্যেই এই অচেনা পরিবারটিতে সে হয়ে উঠেছে মধ্যমনি। তিনমাস পর অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে ফিরে এসে এইশহরের বেশ কিছু পরিবর্তন সে লক্ষ্য করেছে। মতিন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে সে সহজেই বুঝে নিয়েছে -- "গুজবে ভেঙ্গে পড়েছে ঢাকা শহর। মানুষের মরাল ভেঙ্গে পড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আলম তার গেরিলা ইউনিটের কর্তব্য কর্মটি ঠিক করে ফেলে। সে সিদ্ধান্ত নেয় -- " ঢাকা শহরের গেরিলাদের প্রথম কাজ হবে এই মরাল ঠিক করা। নতুন ধরনের গুজবের জন্ম দেয়া। যা শুনে একেক জনের বুকের ছাতি ফুলে উঠবে। এর রাতে আশা নিয়ে ঘুমুতে যাবে। "ঢাকাবাসীর এই আশাপূর্ণ নিদ্রাকে নিশ্চিত করতেই আলম তার গেরিলা দল নিয়ে পরপর কয়েকটি দুর্ধর্ষ অভিযান চালিয়েছেন তাতে কেপে উঠেছে হানাদার বাহিনীর ভিত্তিমূল। নতুন আশার স্বপ্ন দেভার সুযোগ পেয়েছে বন্দী শহর ঢাকার মুক্তিকামী মানুষ। আর এই আশারআলোটুকু জ্বালাতে গিয়েই আলম ও তার সহযোগিদেরকে বিলিয়ে দিতে হয়েছে প্রান। দিতে হয়েছে আত্মাহুতি। এবং নির্বিকারচিত্তেই আলম তা দিয়েছে। স্বাধীনতাযুদ্ধে বাঙালী জাতি তাদের যে শ্রেষ্ঠ সন্তানদের হারিয়েছে -- আলম তাদেরই প্রতিভূ। দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ ও শৌর্যের মহিমায় সে মহীয়ান।

'আগুনের পরশমনির অন্যতম প্রধান চরিত্র রাত্রি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সে। শারীরিক সৌন্দর্য সে অনন্যা। মনের শুভ্রতায় সে অতুলনীয়া। কোমল ও শান্ত স্বভাবের মেয়ে সে। সে ভালবাসে তার বাবা-মাকে, ভালবাসে ছোট বোনকে এবং ভালবাসে স্বদেশকে। দেশকে ভালবেসেই সে ভালবেসেছে আলমকে। আলমের জন্য তার অনিবার উৎকণ্ঠা ও ভালবাসা তাকে অধিকতর কমনীয় করে তুলেছে। তাররুচ, তার সৌন্দর্য এবং তার প্রেম গোটা উপন্যাসের আবহকে সুরভিসিক্ত করেতুলেছে। তার একাকিত্তের বেদনা আশ্রুধারা হয়ে এই উপন্যঅসের শেষাংশকে সিক্ত করেছে। রাত্রি তারঅনুপম লাবন্য, স্নিগ্ধতাআর বিষন্নতা ছড়িয়ে পাঠক চিত্তকে বিবশ করে রেখেছে।

'আগুনের পরশমনি' একই সঙ্গে ঘটনা প্রধান ও চরিত্র প্রধান উপন্যাস। খানকটা নাটকীয়তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনার পর ঘটনার তরঙ্গ এই উপন্যাসের আখ্যানকে জমাট ও আকর্ষনীয় করে তুলেছে। আর এই সবক'টি ঘটনাই আহরিত হয়েছে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপট থেকে। মুক্তিযুদ্ধের আবেগ এই উপন্যাসের আখ্যানকে স্পন্দনশীল করেছে। তার ত্যাগ ও শৌর্যের বীরত্বগাথা মৃত্যুহীন মহিমা নিয়ে এই উপন্যাসে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামেরঅমর আলেখাকে প্রানময় করে তোলার জন্য যে ধরনের অনুভূতিশীল এবং তেজদীপ্ত চরিত্র সৃষ্টি করা প্রয়োজন, অত্যন্ত পারদর্শিতরি সঙ্গেই ঔপন্যাসিক তা সৃষ্টি করেছেন। ফলে প্রায় সবক'টি চরিত্রই হয়ে উঠেছে জীবন্ত এবং প্রানাবেগে ভরপুর। আর এই চরিত্রগুলোর মুখে ঔপন্যাসিক যে সংলাপ জুড়ে দিয়েছেন, তা যেমন যথাযথ, তেমনি মনোগ্রাহী। বর্ণনার ভাষাও প্রাঞ্জল এবং গতিময়। অনাবশ্যক দীর্ঘ বর্ণনা জুড়ে দিয়ে তিনি কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করেননি, এবং করেননি চরিত্রকেও ধোঁয়াটে। সামগ্রিক বিচারের তাই বলা চলে ঘটনা, বর্ণরা,সংলাপ ও চরিত্র সৃজনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঔপন্যাসিক তাঁর পারঙ্গমতা ও পরিমিতি বোধের দ্বৈত দক্ষতা প্রদর্শন করে 'আগুনের পরশমনি' কে সর্বস্তরের পাঠকের কাছেই আকর্ষনীয় করে তুলেছেন।

কিন্তু তারপরেও কিছু কথা থেকে যায়। হুমায়ূন আহমেদের অধিকাংশ উপন্যাসের মতো এই উপন্যাসের ক্যানভাসটিও স্বল্পয়তনিক ও তার গল্প যেখানে পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যেই পরিপুষ্টি খোঁজে, অথবা নিছক ব্যক্তি-হৃদয়ের আনন্দ - বেদনার মধ্যেই নিমজ্জিত থাকে - সেখানে চিত্রপটের প্রসারতার প্রয়োজন নাও হতে পারে। কিন্তু একটি জাতির জাগরনের প্রাণাবেগময় ইতিহাস থেকে হুমায়ূন যখন তাঁর উপন্যাসের আখ্যান আহরণ করেন, তখন সঙ্গত কারনেইতার পটের বিস্তৃতি কাম্য হয়ে ওঠে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভুমি বিশাল। তার কার্যক্রম যেমন বিচিত্র, তেমন বহুমুখী। গল্পে তার খন্ডিত অথবা নির্বাচিত অংশের প্রতিসারিত বাস্তবকে দেখবো - সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু উপন্যাস কেন তার সমগ্রতা সন্ধানে প্রয়াসী হবে না ? মুক্তিযুদ্ধের শুধুমাত্র যে অংশটির মধ্যে পর্যাপ্ত

Dhaka University Institutional Repository

নাটকীয়তা, উত্তেজনা অথবা আনন্দ - বেদনার আশ্লেষ রয়েছে, একজন গল্পকারঅথবা নাট্যকার তাঁর শিল্পের উপকরণ অন্বেষনের জন্য সেকানেই থেমে থাকুন - আপত্তি নেই। কিন্তু একজন ঔপন্যাসিক বিশেষ করে সৃজনের অপূর্ব ক্ষমতা যার করায়ত্ব - তিনি কেন তাঁর পথ চলাকে এত সংক্ষিপ্ত করবেন ? ঔপন্যসিকের পথ আর গল্পকার ও নাট্যকারের পথ যে এক নয়, কিংবা গল্প ও নাটকের নিপুন সংশ্লেষ মানেই যে উপন্যঅস নয় - পঞ্চাশ পেরুনো হুমায়ূন আহমেদ নিশ্চয়ই তা নতুন করে উপলব্ধি করবেন।

'১৯৭১'(১৯৯৫) এর কাহিনী নির্মিত হয়েছে বাংলাদশের একটি হতদরিদ্র গ্রাম নিয়ে। দরিদ্র শ্রীহীন ত্রিশ-চল্লিশ ঘরের একটি বিচ্ছিন্ন জনপদ এটি। এই গ্রামের পাশে রয়েছে জঙ্গলা ' এ ছাড়া রয়েছে সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি কেবল জয়নাল মিয়া। দ'জন বিদেশীর মধ্যে একজন নীলগঞ্জ মসজিদের ইমাম সাহেব অন্যজন নীলগঞ্জ প্রাইমারী স্কুলের আজিজ মাস্টার। পাগল ও আরো কতিপয় চরিত্র। নীলগঞ্জের যে দিকটার জলাভূমি একদল কৈবর্ত থাকে সেদিকে। নীলগঞ্জে হঠাৎ মিলিটারী ঢোকে। মিলিটারীদের ধারনা মুক্তিবাহিনীর একটি দল নীলগঞ্জের জঙ্গলময় ঢুকে পড়েছে। মুক্তিবাহিনীর নির্মূল করা তথা মুক্তিবাহিনীকে আটক করা বা কোথায় লুকিয়ে আছে তারা, এই সত্য উদঘাটন করা মিলিটারীদের উদ্দেশ্য থাকলেও নিরীহ গ্রামবাসীদের একের পর এক নির্মূল করার প্রয়াসে লিপ্ত থেকেছে এরা। এরা আজিজ মাষ্টারের মতো সাধারণ মানুষকেও অমানসিক নির্যাতন করে, মৃত্যুদন্ড কার্যকর করেছে, হত্যা করেছে গ্রামের নীলু সেনকে। অনেকের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে বাড়িঘর। ধর্ষন করতে দ্বিধা করেনি সফর উল্লাহ্‌র স্ত্রী ও বোনকে। মিলিটারীরা গ্রামে প্রবেশের সাথে সাথে রফিকনামের সহচর খানসেনাদের পক্ষে কাজ করলেও উপন্যাসের সমাপ্তিতে রফিককে একজন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধার সাহসিকতায় ও প্রতিবাদী দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধার কাজ করতে দেখা গেছে। ফলে মিলিটারীর মেজর এজাজ সন্দেহ ভাজন হয়ে ওঠে এবং এ সময় রফিককে গুলী করার জন্যে খালের বুক পর্যন্ত পানিতে দাঁড় করায় এবং গুলী করে হত্যা করে। হত্যার পূর্বে রফিকের সহিসিকতায় ও প্রতিবাদের একটি উদাহরণ দেয়া হলো,

> মেজর এজাজ আহমেদ পারে দাঁড়িয়ে আছেন। তার পাশে ডানদিকেচাইনীজ রাইফেল হাতে দ'জন জোয়ান এসে দাঁড়িয়েছে। রফিক নেমেছ বিলে। বিলের পানি অসম্ভব ঠান্ডা। রফিক পানি কেটে এগুচ্ছে। কি যেন ঠেকল হাতে। মনারছোট ভাই হিরু। উপুর হয়ে ভাসছে। যেনভয় পেয়ে কাছে এগিয়ে আসতে চায়। রফিক পরম স্নেহে হিরুর গায়ে হাত রেখে বলল ভয় নাই। ভয়ের কিছুই নাই। পাড়ে বসে থাকা মেজর সাহেব বললেন, কার সঙ্গে কথা বলছ রফিক।
> ঃ নিজের সঙ্গে মেজর সাহেব।
> ঃ কি বলছ নিজেকে ?
> ঃ সাহস দিচ্ছি। আমি মানুষটা ভীতু। পৃ: ৬৮(১৯৭১)

অবশ্য রফিককে বু সমান পানিতে দাঁড় করিয়ে, রফিককে গুলীর মুখে ছেড়ে দিয়ে লেখক গুলি করে হত্যার সরাসরি ঈঙ্গিত না করলেও, রফিক যে সাহসী মানসিকতায় স্বদেশের মমত্ববোধে মৃত্যুকে বরন করে নিয়েছে এর প্রতীকি উপস্থাপন লক্ষ্য করা যায়। বাঙালীর রক্তাক্ত সময় ও সাহসী মানুষের প্রতিবাদ এবং স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে হুমায়ূন আহমেদ মেজর এজাজের উপলব্ধির মধ্যে দিয়ে উদ্ভাসিত করেছে। যেমন -

> কৈবর্ত পাড়ায় আগুন ছাড়িয়ে পড়েছে। আলো হয়ে উঠেছে চারিদিকে। রফিককে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এবার। ছোটখাট অসহায় একটা মানুষ। বুক পানিতে দাঁড়িয়ে আছে। মেজর সাহেব বললেন রফিক তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও ? রফিক শান্ত স্বরে বলল, চাই মেজর সাহেব। সবাই বেঁচে থাকতে চায়। আপনি নিজেও চান। চান না । (১৯৭১)
> মেজর সাহেব চুপ করে রইলেন। রফিক তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, মেজর সাহেব, আমার কিন্তু মনে হয় না আপনি জীবিত ফিরে যাবেন এ দেশ থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ কেবল গ্রাম নয়, শহরও। এ যুদ্ধে পাকিস্তানীরা গ্রাম আর শহর উভয় স্থানের জনজীবনকে করে তুলেছে আতংকগ্রস্ত। বাঙালীকে করে রেখেছে অবরুদ্ধ। বাংলাদেশকে করে তুলেছে দুর্গত। এই দুর্গত এলাকায় পাকিস্তনি বাহিনী দ্বারা হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হিন্দু হোক আর মুসলমান হোক বাঙালি বলে নির্যাতন চালিয়েছে তারা। তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা স্বাধীনতার বিপক্ষে কাজ করেছে, সেজেছে পাকিস্তানীদের দোসর, তাদের কিছুটা বিশ্বস করে, বাকী সবমুসলমানদেরকে তারা সন্দেহের চোখে দেখেছে, দেখেছে সংশয়ের চোখে এবং চালিয়েছে নির্যাতন। আর হিন্দু সম্প্রদায়ের একবারেইতাঁদের আস্থাভাজন হতে পারেনি। ফলে বাংলাদেশের প্রত্যেক জায়গায় হিন্দুরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নির্যাতিত হয়েছে। ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার ফলে হারিয়েছে ভিটেবাড়ি। অনেকেই আশ্রয় নিয়েছে ভারতের শরনার্থী শিবিরে। সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিচেতনা থেকে পাকিস্তানী সৈন্যরা যে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর অকথ্য ও নির্মম অত্যাচার করেছে তার জ্বলন্ত উদাহরন হুমায়ূন আহমেদের 'অনিল বাগচীর একদিন (১৯৯৬) উপন্যাসটিতে।

পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী এবং সৈনিকদের আশ্রয়স্থল ছিল কেবলমাত্র ধর্মীয় কৌশল। ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ারে ব্যবহার করে বাঙালিকে আরো অীধককাল পরাধীন ও শোষনের যাতাকলে রাখার নিরন্তন চেষ্টা চলছিল প্রতিনিয়ত। কিন্তু বাঙালিরা দেশমাতৃকার জন্যে যে মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে, প্রতিরোধের পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে তা পশ্চিমাদের কৌশলী মননে ধরা পড়েনি। 'অনীল বাগচীর একদিন' (১৯৯৬) উপন্যাসটি সম্পর্কে বলা যায় ,

> উপন্যাসটি সত্যিকার অর্থে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের একটি ভিন্ন ছবি। কারণ, ঐতিহাসিক সত্যতা রক্ষা করতে গেলে সকলেই স্বীকার করবেন, মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদশের সর্বস্তরের জনগণের পাশাপাশি হিন্দু সম্প্রদায় বেশী এবং বিশেষ নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। যদিও এ নির্যাতনের একটি ঐতিহাসিক কারন রয়েগেছে।এর গোড়াপত্তন হয়েছিল তিরিশের দশকের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে।

'অনিল বাগচীর একদিন' রক্তাক্ত সময়েরই প্রতিনিধিত্বকারী উপন্যাস। কেননাঅনিল বাগচীর বাবা সুরেশ বাগচী একজন নিবেদিত প্রান শিক্ষক হয়েও হিন্দু সম্প্রদায়গত বলে মিলিটারীদের হাত থেকেরক্ষা পাননি। আইয়ুব আলি শত চেষ্টা করেও মিলিটারীদের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি অনীলকে। অনিলের অপরাধ সে হিন্দু। একাত্তরের রক্তাক্ত সময়ে বাঙালী শুধু সাহসী ও প্রতিবাদী হয়নি। প্রতিরোধ ও গড়েছে। রক্তাক্ত সময়ের উপর দাঁড়িয়েই বাঙালি অংশ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে, আশঙ্খা করেছে একটি নতুন ভোরের। নতুন সকালের। সে সকাল কখন আসবে তা হয়তো জানা নেই। এরই যথার্থ প্রতিফলন লক্ষনীয় 'সৌরভ' ও 'আগুনের পরশমনি' উপন্যাস দুটিতে।

এই দুটি উপন্যাসের মধ্যে মধ্যে কাহিনীর ঐক্যবদ্ধতা আছে। আছে প্রতিরোধের প্রস্তুতি ও বিকাশের ধারাবাহিকতা।

এই উপন্যাস দুটি গ্রামকে ছাড়িয়ে অবরুদ্ধ ঢাকা শহরের পরিধি নিয়ে রচিত। একদিকে সৌরভ এর কাদের রফিক, মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিং নিতে যায় আগর তলায়। অন্যদিকে আগুনের পরশমনি এর আলম, সাদেক, গৌরাঙ্গ মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে ফিরে আসে যুদ্ধের জন্য এবং তাদের অপারেশনের কারণে ঢাকা যেন ভেতর থেকে কিছুটা নড়ে ওঠে ভিন্নমাত্রর জীবনবোধে। এই উপন্যাস দুটোতেই মূলত: বাংলাদেশে মুক্তিসংগ্রাম ও দুর্যোগের সময় হুমায়ুন আহমেদ যে বিরোধী সত্তায় ছিলো দায়বদ্ধ, ছিলো বিপন্ন বাক স্বাধীনতার সপক্ষের প্রতিবাদী ও সাহসী মানুষ তা উপন্যাস দুটোর উল্লেখিত চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদের অধিকাংশ উপন্যাসের মতো মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস গুলোর ক্যানভাসও স্বল্পায়তনিক। তাঁর গল্প যেখানে পরিবারের চৌহদ্দির মধ্যেই পরিপুষ্টি খোঁজে,

Dhaka University Institutional Repository

অথবা নিছক ব্যক্তি-হৃদয়ের আনন্দ বেদনার মধ্যেই নিমজ্জিত থাকে - সেখানে চিত্রপটের প্রসারতার প্রয়োজন নাও হতে পারে। কিন্তু একটি জাতির জাগরণের প্রাণাবেগময় ইতিহাস থেকে তিনি যখন তাঁর উপন্যাসের আখ্যান আহরণ করেন, তখন সঙ্গত কারণেই তার পটের বিস্তৃতি কাম্য হয়ে ওঠে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি বিশাল। তার কার্যক্রম যেমন বিচিত্র, তেমনি বহুমুখী। গল্পে তার খন্ডিত অথবা নির্বাচিত অংশের প্রতিসারিত বাস্তবকে দেখবো - সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু উপন্যাস কেন তার সমগ্রতা সন্ধানে প্রয়াসী হবে না। মুক্তিযুদ্ধের শুধুমাত্র যে অংশটির মধ্যে পর্যাপ্ত নাটকীয়তা, উত্তেজনা অথবা আনন্দ-বেদনার আশ্লেষ রয়েছে, একজন গল্পকার অথবা নাট্যকার তাঁর শিল্পের উপকরণ অন্বেষণের জন্য সেখানেই থেমে থাকুন আপত্তি নেই। কিন্তু একজন ঔপন্যাসিক, বিশেষ করে সৃজনের অপূর্ব ক্ষমতা যাঁর করায়ত্ত -- তিনি কেন তাঁর পথ চলাকে এত সংক্ষিপ্ত করবেন। ঔপন্যাসিকের পথ আর গল্পকার ও নাট্যকারের পথ যে এক নয়, কিংবা গল্প ও নাটকের নিপুন সংশ্লেষ মানেই যে উপন্যাস নয় -- পঞ্চাশ পেরুনো হুমায়ূন আহমেদ নিশ্চয়ই তা নতুন করে উপলব্ধি করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইমদাদুল হক মিলনের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

ইমদাদুল হক মিলন (১৯৫৫-০) একজন গল্পকার ও ঔপন্যাসিক। তাঁর গল্প, উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা স্বতস্ফূর্তভাবে এবং আবেগ সমৃদ্ধ সুষমায় উঠে এসেছে। তাঁর মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলো হচ্ছে -- 'কালো ঘোড়া' (১৯৮৩),'ঘেরাও' (১৯৮৫), 'মহাযুদ্ধ (১৯৮৯)', 'বালকের অভিমান' (১৯৯০), 'নিরাপত্তা হই'। মুক্তিযুদ্ধকে পাঁচ রকম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবার প্রয়াস রয়েছে এই রচনাগুলিতে।

ইমদাদুল হকের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সম্পর্কে যথার্থই বলা চলে যে,

> মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক পাঁচটি উপন্যাসে ইমদাদুল হক মিলন স্বাধীনতা সংগ্রামকে পাঁচ রকম দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর উপন্যাসের যুদ্ধ চলাকালীন উত্তপ্ত সময়টি যেমন উঠে এসেছে, তেমনি যুদ্ধোত্তর বিলোড়িত সময় উপস্থাপিত হয়েছে চমৎকারভাবে। স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থা, সামাজিকও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তিনি উপন্যাসের বিষয় হিসাবে নির্বাচন করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে অনেকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে দুর্নীতি পরায়ণ হয়ে উঠে নাম লিখেছেন রাজাকারে, অলবদরে, শান্তি কমিটিতে। সহযোগিতাকরেছেন পাকসেনাদের। এদেশের রমনীদের পশ্চিমা সৈনিকদের হাতে ধর্ষনের জন্য তুলে দিতে দ্বিধা করতেন না। শুধু তাই নয় নিজেরা পর্যন্ত অংশ নিয়েছেন।

'কালো ঘোড়া' (১৯৮৩) উপন্যাসেই আমরা দেখতে পাই গ্রামের চেয়ারম্যানকে শান্তি কমিটিতে যোগ দিতে। এবং মিষ্টির দোকানদার রতন লালের দোকানের কাজের ছেলে কিশোর নয়নার সাথে গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা মন্না, কাদের, খোকা, আলম-রা থাকার কারনে ময়নাকে পিটিয়ে হত্যার পরও চেয়ারম্যান রতন লালের মেয়ে কালিকে ধর্ষন করে। রতন লালের অপরাধ - কেনো সে মন্নাদের নয়নার সাথে গা-ঢাকা দিতে সহযোগিতা করেছে।

'ঘেরাও (১৯৮৫) উপন্যাসের বুলবুলের বাবার কথাও এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য। বূলবূল যখন তার বাবার সাথে মুক্তিযুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে তখন বুলবুলের বাবার কণ্ঠে যে মন্তব্য বেরিয়ে আসে তাতে মধ্যবিত্তের শ্রেণী চরিত্রের তাৎপর্যহীনতা এবং তরুন্যের বিপর্যয়কে প্রকাশ করে। প্রকাশিত হয় মধ্যবিত্তের স্ববিরোধী ও হতাশাগ্রস্ত মনোভাব। যেমন,

> বাবা বললেন, শহরের লোকজন আর একজন ও বাঁচবে না রে বুলবুল। কি জানি আমরাও বেঁচে থাকি কিনা। ওরা তো গ্রামে হামলা করতে শুরু করেছে।
> মুক্তিযোদ্ধারা যদি রাজাকার গুলোকে না মারত তহলে হয়তো আরো অনেক দিন শান্তিতে শহরেই থাকতে পারতাম আমরা। (পৃ:১৪৩ 'ঘেরাও)

কিংবা বুলবুলের নানারবাড়িতে অবস্থান নেওয়ার সময় একটি উদাহরণ টানা যেতে পারে। বুলবুলরা যখন তার নানার বাড়িতে পোঁছলো তখন সেখানে গিয়ে জানতে পারলো বুলবুলের মামাতো ভাই মন্টু বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। এই নিয়ে বুলবুলের বাবা কথা বলছিল বুলবুলের মামার সাথে। তখনও বুলবুলের বাবা হতাশাগ্রস্ত মনোভাবকেই মূর্ত করেছে -

> আপনার মনে হয় এই সব ছেলে ছোকরা এইভাবে এত সহজে দেশটা স্বাধীন করে ফেলবে। (পৃ: ১৫৫ 'ঘেরাও')

তবে মধ্যবিত্তের বৃহৎ অংশ কিন্তু যুদ্ধচলাকালীন সময়ে খুব একটা স্ববিরোধী মনোভাব স্থির থাকেনি। কারো কারো মধ্যবিত্তের পিছু কাজ করলেও অনেক সে বৃত্তের বাইরে আসতে

Dhaka University Institutional Repository

পেরেছিলেন। বুলবুলের মামার কথাই ধরা যাক। বুলবুলের বাবা অনেক হতাশাবাদী কথা ব্যক্ত করলেও বুলবুলের মামা তার সাথে ঐক্যমত পোষন না করে বলে উঠেছেন,

> সময় হয়তো লাগবে। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবেই। কোন একটা জাতির সব মানুষ যখন জেগে যায় তখন যত বড় শক্তিই হোক, বেশি দিন তাদের দাবিয়ে রাখতে পারে না। (পৃ: ১৫৫ 'ঘেরাও')

তারুণ্যের জীবন চেতনা যেখানে গোলাপের সৌরভে বিকশিত। সেখানে কোনো অপশক্তিই স্বাধীনতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না এ বিশ্বাস ও দৃঢ়তা বাঙালিযুবসমাজ তথা স্বাধীনতাকামী মানুষের রক্তের সাথে মিশে গিয়েছিল বলা যায়।

'কালো ঘোড়ার মন্না, কাদের, খোকা,আলম এরা তারুণ্যের জীবন চেতনায় স্নাত। ফলে গ্রামে বাস করেও তারুণ্যের উজ্জ্বলতায় নিজেদেরকে চিনে নিতে পেরেছে। 'ঘেরাও' - এর মন্টুর কথা উল্লেখযোগ্য এক্ষেত্রে। দেশে স্বাধীনতার জন্যে যুদ্ধ শুরু হলে ওরা ঠিকই সচেতন হয়ে ওঠে এবং অংশ নেয় মুক্তিযুদ্ধে।

শুধু তাই নয়, 'ঘেরাও' এর বুলবুল মধ্যবিত্ত মানসিকতার পরিবেশে বড় হয়েও, তার নানার বাড়িতে অবস্থানকালে তার খালাতো বড় বোন, ইউনিভার্সিটিতে পড়ুয়া ছাত্রী চম্পার যৌন কামনায় শিকার হওয়া সত্ত্বেও যে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মিলিটার ক্যাম্প ঘেরাও এ অংশ নেয়, ঐ তারুণ্যের জীবন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণে।

বুলবুল যে মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারেনি সে জন্যে নিজেকে নিজেই ধিক্কার দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। বুলবুলরা যখন নৌকাদিয়ে শহর ছেড়ে গ্রামের উদ্দেশ্যে নানার বাড়ি যাচ্ছিল তখন নৌকায় বসে বুলবুলের কল্পনায় সে চিত্র উদ্ভাসিত -

> কিন্তু না, আসল দৃশ্যটা তা নয়। বরং মিলিটারীদের ভয়ে শহর ছেড়ে কাপুরুষের মতো নিরাপদ জায়গায় পালিয়ে যাচ্ছে বুলবুল। এই কি পুরুষ জন্ম। বুকের ভেতর থেকে বুলবুল শুনতে পায় আরেকজন বুলবুল তাকে বলছে, ধিক বুলবুল, ধিক তোমাকে (পৃ: ১৪৭ ' ঘেরাও')

তারুণ্যের বিবেক তাকে তাড়িত করেছে। শুধু তাই নয় চম্পার প্রেমে যে বুলবুল মগ্ন থেকে নানার বাড়ির ত্রিসীমানা ডিঙিয়ে বাড়ির বাইরে যেতে পারেনি, সেইবুলবুল সময় সচেতন হয়ে মিঠুদের ঘেরাও অভিযানে অংশ নিয়ে চম্পার বিকৃতিপূর্ণ কামনা বাসনাকে চরমভাবে আঘাত করে তারুণ্যের চেতনাকে বলিষ্ঠ ও মর্যাদা দান করেছে। কিন্তু তারুণ্যের এই জীবন চেতনাকে আর বেশিদিন ধরে রাকা সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হলো ঠিকই, রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মুক্তি ঘটলো ঠিকই কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি বলে তারুণ্যের জীবন চেতনায় নেমে আসে বিপর্যয়।

'কালো ঘোড়া'য় আমরা দেখতে পাই, দেশ স্বাধীন হবার পর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে দারুন হতাশাকাজ করে। এর প্রধান কারণ অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা। সামাজিক অনিশ্চয়তাও এর জন্য বহুলাংশে দায়ী। যুদ্ধ শেষে মন্ন, খোকা, আলম, কাদেরদের অর্থনৈতিক যে অসচ্ছলতা, তা দেখেই স্পষ্ট বুঝা যায় স্বাধীনতা প্রাপ্তিহলেও অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি। মন্না তার টাকার অভাবে পছন্দ সই মেয়েটাকে বিয়ে করতে পারে না। ওদের মাঝে কেবলই হতাশা। আর হতাশা,

> কাদের বলল, এই রকম বেকার থাকলেনি ঘুম আহে। মন্না বলল, সিগ্রেট খাওনের পয়সাটাও থাকে না। বাইত থনে কত লওন যায়। (পৃ: ৩১৬)

মন্নার বিয়ে প্রসঙ্গ আসলে আমরা দেখতে পাই টাকা রোজগারের জন্য ওরা ডাকাতির জন্য প্রস্তুতির পরামর্শ করে।

'মহাযুদ্ধ' (১৯৮৯) উপন্যাসেও স্বাধীনতা উত্তর মাত্র এক বছরের মধ্যে ঘটে যাওয়া যে পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তাতে তারুন্যের বিপর্যয় ছাড়া আর কিছু নয়।

Dhaka University Institutional Repository

'মহাযুদ্ধ' উপন্যাসের কিছু বর্ণনা থেকে এ সত্যটির বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যাবে। স্বাধীনতার অল্পকিছু কাল পরে অর্থাৎ বাহাত্তর সালের দিকে, তখনো জয়ের উল্লাস চারিদিকে স্তিমিত হয়নি,তখন নতুন মর্যাদায় পরিচিত হচ্ছিল বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে, সেই সন্ধিক্ষনের সময়কে ধারণ করেছে 'মহাযুদ্ধ' উপন্যাসটি স্বাধীনতার নতুন জোয়ার জোশে, জনজীবনে একটি মুক্তি উল্লাস পরিলক্ষিত হলেও অল্প কিছুকাল পরেই নেমে আসে অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা। মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন, নৈতিক অবক্ষয়, ভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি যোগযোগ, যুবকদের মধ্যে হতাশাও অপকান্ডের দৌরাত্ম, সর্বোপরি জাতীয় জীবনে নেমে আসে এক সামগ্রিক বিপর্যয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে মানুষের জীবনে নানামুখী সংকট এসে বাসা বাধে কিন্তু এর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনে রাষ্ট্র ক্ষমতা অসমর্থ হলে গোটা দেশের জনগণই দুর্বিপাকে পড়ে। আর এ দুর্বিপাক তারুণ্যের জীবন চেতনাকে শ্রীয়মান করে তোলে। এইযে বিপর্যয় তা কেবল স্বাধীনতার পর কিছুকাল স্থায়ী নাহয়ে স্বাধীনতার পরও অব্যাহত আছে।

স্বাধীনতার অল্প কিছুকাল পরে অর্থাৎ বাহাত্তর সালের দিকে, তখনো জয়ের উল্লাস চারিদিকে স্তিমিত হয়নি, যখন নতুন মর্যাদায় পরিচিত হচ্ছিল বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে, সেই সন্ধিক্ষনের সময়কে ধারণ করেছে 'মহাযুদ্ধ' উপন্যাসটি। স্বাধীনতার নতুন জোয়ার জোশে,জনজীবনে একটি মুক্তি উল্লাস পরিলক্ষিত হলেও অল্প কিছুকাল পরেই নেমে আসে অর্থনৈতিক সংকট ওসামাজিক নিরাপত্তাহীনতা। মূল্যবোধের দ্রুত পরিবর্তন, নৈতিক অবক্ষয়, ভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ, যুবকদের মধ্যে হতাশা ও অপকান্ডের দৌরাত্ম্য, সর্বোপরি জাতীয় জীবনে নেমে আসে এক সামগ্রিক বিপর্যয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্থানে চলতে থাকে সীমাহীন দুর্নীতি, অত্যাচার, স্বেচ্ছাচার, সাধারণ ক্ষমার পর রাজাকার আলবদর বাহিনীর অনেকে নকল মুক্তিবাহিনীর নামে ডাকাতি, রাহাজনি,ছিনতাই, দলে দলে লোক মুক্তিবাহিনী সাজার প্রবনতা, সেই সময় কেউবা আত্মগত কারণে কেউবা অবস্থার শিকারে পরিণত হয়ে অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে বৃন্ত ছুট হতে হয়েছে। অস্ত্র জমা দেয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের জীবনে নেমে আসে দারুন হতাশা ও অর্থনৈতিক অনটন, কেননা, অস্ত্র জমা দেয়ার পর অনেকে, রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিদা পেলেও অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত হয়নি। ফলত: সীমাহীন দুর্বিপাকে পড়ে সমস্ত জাতি।

ইমদাদুল হক মিলন এই বিলোড়িত সময়কে পূর্ণ মাত্রায় তুলে ধরেছেন 'মহাযুদ্ধ' উপন্যাসে।

'বালকের অভিমান' (১৯৯০) ইমদাদুল হক মিলনের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এই উপন্যাসে তিনি তৎকালীন কিশোর কিশোরীদের অবস্থার উপর আলোকপাত করেছেন। যদিও ঔপন্যঅসিক একানে অভিমানটাকেই ব্যবহার করেছেন, কিন্তু মূল বিষয় হচ্ছে একাত্তর সালের নব্য যুবকদের মানসিক অবস্থাকে তুলে ধরা এবং সেটা তিনি সাফল্যের সঙ্গেই পেয়েছেন।

ঔপন্যাসিক নীলু এবং শিমুর মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দেখালেও আসল ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়, মূল বিষয়টি হচ্ছে একাত্তরের সামাজিক বাস্তবতা। অভিমানকে এখানে অনুষঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে উপন্যাসের আবহ সৃষ্টিরজন্য বয়:সন্ধির আবেগ এবং অভিমানও যে একজন বালককে অন্ধকার জীবনের দিকে ঠেলে দিতে পারে তা অস্বীকার্য নয়। তবু এখানে মুক্তিযুদ্ধের কিয়ৎ পরবর্তীর পটভুমির তাৎপর্যে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে এবং সেই কারণেই "বালকের অভিমান" উপন্যাসের একটা আলাদা গুরুত্ব রয়েছে।

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়টি যে ইমদাদুল হক মিলকে খুব বেশী বাবিত করেছে, তার একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলোতে পাওয়া যায়। উনিশ'শ একাত্তর সালে যুদ্ধ চলাকালীন সময়কে নিয়ে তিনি যেমন লিখেছেন 'ঘেরাও' তেমনি যুদ্ধোত্তর বাহাত্তর সালের সামাজিক বাস্তবতা নিয়ে লিখেছেন 'মহাযুদ্ধ' চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ, অর্থনৈতিক অনটন ওজাতীয় নিরাপত্তাহীনতাকেনিয়ে তিনি রচনা করেছেন

Dhaka University Institutional Repository

'নিরাপত্তা হই'। এই উপন্যাসগুলোতে একটা ধারাবাহিকতা ও ভিন্ন দৃষ্টিকোণের পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বাধীনতার তিন বছর পরে অর্থাৎ উনিশ'শ চুয়াত্তরে জাতীয় জীবনে নেমে আসে এক নির্মম বিপর্যয়, শুদু অর্থনৈতিক অনটন নয়, খাদ্যের অভাবে শত শত লোকের মৃত্যুর সংবাদ তখন নিত্য দিনের ব্যাপার হয়ে যায়। সাথে সাথে আইন শৃঙ্খলারও দ্রুত অবনতি ঘটে। শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে ইমদাদুল হক মিলনও বিষয়টিকে উপস্থিত করেছেন বিশ্বস্ততার সঙ্গে। সমাজের ভেতর কাঠামোতে চলছে তখন তুমুল ভাঙচোর। কেউবা উপোসে মরছে, কেউবা অর্থের পাহাড় গড়ছে।

'নিরাপত্তা হই' উপন্যাসে নিরাপত্তার ধারক মন্টু। যদিও সেই নিরাপত্তার আয়োজন করতে তাকে অস্ত্র হাতে নিতে হয়েছিল। উনিশ'শ চুয়াত্তরের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাকে স্মরন করিয়ে দেয় এই উপন্যাস। সামাজিক বাস্তবতার এই প্রেক্ষিত কারো অজানা নয়। ঔপন্যাসিক নিরাসক্ত দৃষ্টি দিয়ে পুরো দেশের অবস্তাকে তুলে ধরেছেন।

'ঘেরাও' উপন্যাসটি স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন উত্তপ্ত সময়কে ধারণ করেছে। হানাদার পাকিস্তানীরা যকন ঘুমন্ত মানুষের উপর বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে, আতর্কিতে আমাদের দেশে দখল করে, ঘর বাড়ী পুড়িয়ে, লুটপাট শুরু করে, তখন অসহায় মানুষ আপন প্রাণ বাঁচাতে নিজের বাস্তভিটা ছেড়ে পালাতে শুরু করে। ঘেরাও উপন্যাসটিতে বাস্তভিটা ছেড়ে যাওয়া মানুষের করুণ আর্তনাদ ধ্বনিত হয়েছে। 'ঘরোও' অভিযানে বুলবুলের অংশগ্রহনের মধ্য দিয়ে লেখক উপন্যাসের পরিণতি টেনেছেন, সেই হিসাবে 'ঘেরাও' নামটি সার্থক।

"ঘেরাও" উপন্যাসের যৌন প্রসঙ্গ নিয়ে অনেকে অভিযোগ করেন। কিন্তু একথা ভেবে দেখেন না যে, সেকসকে লেখক একটি বিশেষ তৎপর্যে ব্যবহার করেছেন। সেই হিসাবে এটা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক নয়।

উপন্যাসটির নামের মধ্যে একটা প্রতীকী ব্যঞ্জনা রয়েছে। গ্রামীন পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসে ইমদাদুল হক মিলন যুদ্ধ চলাকালীন সময় এবং স্বাধীনতার অল্প কিছুকাল পরের অবস্থাকে তুলে ধরেছেন। বস্তুত স্বাধীনতা নামক কালো ঘোড়ার পেছনেই যেন ধাবমান এই জনগোষ্ঠী। যে ঘোড়ার নাগাল কোন কালে পাওয়া গেল না। উপন্যাসের এই পরি সমাপ্তিতে কালো ঘোড়া একটি প্রতীকি ব্যঞ্জনা দান করেছে। ইমদাদুল হক মিলনচরিত্র চিত্রনে রূপ-দক্ষ শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তার সৃষ্ট চরিত্রগুলো আপন ভাষায় নিজেকে ব্যক্ত করেছে, সজীব মানুষের মত। ঘটনা নির্বাচনে তিনি যেমন বৈচিত্র সন্ধানী তেমনি চরিত্র সৃজনেও বহুগামী। বিচিত্র পেমার জাতের মানুষ তাঁর উপন্যাসে এসে ভিড় জামিয়েছে জীবনের প্রয়োজনে। গ্রাম্য বাজারের মিষ্টি দোকানদার রতন লাল,যেকিনা গাহাককে দেবতা বলেই মনে করে। তার রয়েছে একটি মাত্র মেয়ে। তাও বোবা, নাম তার কালি 'কালো ঘোড়া' উপন্যাসের এই মিষ্টি দোকানদার আমাদের মমতা কেড়ে নেয়।

তরঙ্গায়িত সমকালে দাঁড়িয়ে একজন ঔপন্যাসিক যেমন উপলব্ধি করেন তার স্বকালকে তেমনি উপার্জন করে নেন অতিক্রান্ত অতীত থেকে প্রয়োজনীয় উত্তাপ ও অনুষঙ্গ। কতা সাহিত্যের এই আমূল উপযোগিতাকে অঙ্গীকার করে ইমদাদুল হক মিলন মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসগুলো লিখেছেন। প্রকরণ - পরিচর্যায় পরিশ্রুত ইমদাদুল হক মিলনের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাসগুলোতে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষিত হয়েছে বিশ্বস্থতার সঙ্গে। মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস রচনাকালে স্বাধীনতার স্বপক্ষের চেতনা পরিপুষ্ট ছিল তাঁর মননে। আমাদের মহান মুক্তি সংগ্রামকে পরিপ্রেক্ষিত করে নবীন-প্রবীণ ঔপন্যাসিকরা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস রচনা করলেও তা শুধু পরিসংখ্যানের, উৎকর্ষতার নয়। কেননা এর বেশীর ভাগ উপন্যাসেই রচিত হয়েছে স্মৃতি বা শ্রুতি থেকে। এবং তা মধ্যবিত্তের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা। তবে শিল্প-সফলতার মানদন্ডে উন্নীত না হলেও এসব উপন্যাস মুক্তি সংগ্রামের এক বহু বিচিত্র এ্যালবাম। তাঁর উপন্যাসের যুদ্ধচলাকালীন উত্তপ্ত সময়টি যেমন উঠে এসেছে, তেমনি যুদ্ধোত্তর বিলোড়িত সময় উপস্থাপিত হয়েছে চমৎকার ভাবে। স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থা, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তিনি উপন্যাসের বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মঈনুল আহসান সাবেরের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

মঈনুল আহসান সাবেরের (১৯৫৮-০) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চারটি উপন্যাস হলো, 'পাথর সময়' (১৯৮৯),পরাজয়'(১৯৯০), 'কেউ জানে না' (১৯৯০), 'সতের বছর পর' (১৯৯১)। এই চারটি উপন্যাসের মধ্যদিয়েমইনুল আহসান সাবের স্বাধীনতা-উত্তর, বিশেষ করে স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১৭ বছর পর মুক্তিযুদ্ধেরচেতনায়রাজনৈতিক সংকটের স্বরূপ এবং তার পরিনতি বিবৃত করেছেন আর সে পরিনতিতে রয়েছে মূল্যবোধের বিনষ্টি।তাঁর উপন্যাস চতুষ্টয়ের স্বরূপ ও পরিণতিতে আমরা দেখতে পাই পুনরুত্থান ঘটেছে একাত্তরের পরাজিত শক্তির।

স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির পুনরুত্থানের প্রতীকী চরিত্র 'পাথর সময়' -এর সে, বিডি, 'পরাজয়'-এর বিডি, 'কেউ জানে না'-র বিডি এবং 'সতের বছর পর'-এর বিডি ও রাব্বানী বিডি চরিত্র বিভিন্নভাবে বিকশিত হয়েছে সাবের-এর ৪টি উপন্যাসে। কেউ জানে না-র বিডি একাত্তরের পরাজিত শক্তি। অথচ স্বাধীনতা উত্তর সতর বছর পরে পুনরুত্থিত শক্তি। লেখকের ভাষায় বলা যায়,

> মুক্তিযুদ্ধের সময় বিডি ছিলো সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষে। শুধু পক্ষে নয়, তাদের সঙ্গে বিভিন্নভাবে জড়িত ছিলো সে। পাকিস্তানি সোলজারদের সব ধরণের আরাম আয়েসের ব্যবস্থা করে দেয়া আর চাহিদা মেটানোর জন্যে বিডি ছিল সদাতৎপর। আর তার কাজ ছিলো পাকিস্তানিদের কাছে প্রয়োজনীয় খবর সরবরাহ করা। পৃঃ ৪৯।

পরাজয়ের বিডির বৈশিষ্ট্য ও অনুরূপ ছিলো একাত্তরের । অথচ 'পরাজয়' -এর এবং 'কেউ জানে না' -এর দুটি মুক্তিযোদ্ধার পরিবার সামাজিক গ্লানিও নিগৃহীত হওয়া থেকে সতর বছর পর বেহায় পায় ঐ বিডির ক্ষমতা বলে, সহযোগিতার কারণে।

'কেউ জানে না' উপন্যাস সাহানা শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী। সে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষিকা। একমাত্র বড়ছেলে মধ্যপ্রাচ্যে চাকুরী নিয়ে চলে গেলেও অর্থ বেশী রোজগার হয় না। একমাত্র মেয়েটি কলেজ পড়ুয়া। ঘরে আছে বৃদ্ধ শ্বশুর ও শাশুড়ী। কিন্তু সাহানার পরিবারটি হঠাৎ একটি সমস্যায় জড়িয়ে যায়। রহমত আলী নামের এক বয়স্ক ব্যক্তি এসে দাবি করে সাহানা যে বাড়িতে আছে সেটির প্রকৃত মালিক সাহানারা নয়। কিংবা সাহানার শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্বামী মারুফও কিনেনি। বাড়িটির প্রকৃত মালিক যে রহমত আলী তা দাবি করে। সাহানা াকে বোঝাতে চায় তার শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্বামী মারুফের তাকে বোঝাতে চায় তার শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্বামী মারুফের স্বপ্নের এই মাটি। গায়ের রক্ত পানি করে দেয়া টাকায় এই সামান্য জমিটা কিনেছিল। কিন্তু রহমত আলী জমিটির মালিকানায় বৈধতার প্রশ্ন তুলে মহল্লার গুন্ডা প্রকৃতির তরুনদের দিয়ে বার বার শাসিয়ে যায়। সাহানা ছুটি রেজিষ্ট্রি অফিসে দলিলের খোঁজে । কিন্তু সে অফিসে যোগাযোগ করে সে নিরাশ হয়। শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী হিসেবে সহযোগিতা চায় প্রতিবেশীর কাছে। পুলিশ বিভাগে, স্বামীর এক সময়ের মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু বর্তমানে মন্ত্রী-তার কাছে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কাছে। কিন্তু কোথাও সে সহযোগিতা পায় না। কেবলমাত্র মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নামে মাত্র পত্রিকায় বিবৃতি ছাড়া।

রহমত আলীর উগ্রতায় এক সময় সাহানা বিদ্রুপের স্বীকার হয়। জমিটা হাত ছাড়া হয়ে যাবার উপক্রম যখন তখন একাত্তরের পরাজিত রাজাকার বিডি উপযাচকের মতো সাহানার এ দুর্দিনে এগিয়ে আসে। রহমত আলীকে একদিন ধরে এনে সাহানার কাছে মাফ চেয়ে নিয়ে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। রহমত আলীর উৎপাত থেকে বাঁচার উপায় বিডিই করে দেয়। যা পারেনি মুক্তিযোদ্ধারা দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা, পুলিশ বিভাগ কিংবা অন্য কেউ। অথচ এই বিডিউ দেশ স্বাীন হবার পর দালালীর দায়ে অভিযুক্ত ছিলো, ধরা পড়েছিলো। কিন্তু দালাল আর কাকে বলে- মারুফের দূর সম্পর্কীয় ভাই পরিচয় দিয়ে বেঁচে যায়।

'পরাজয়' - উপন্যাসে প্রায় একই ব্যাপার ঘটে। 'পরাজয়'-এর কাহিনী গড়ে ওঠে এক অভিমানী মুক্তিযোদ্ধা বাবার পরিবার নিয়ে। তাঁর জামিল নামের ছেলে পড়াশুনা শেষ

Dhaka University Institutional Repository

করে চাকুরী খুঁজছে। তেরটি ইন্টারভিউ দিয়েও চাকুরী হয়নি। চৌদ্দ নম্বরের চাকুরীর দরখাস্ত যখন করতে যাবে তখনই একধরণের ঝামেলায় জড়িয়ে যায় জামিল এবং তার মুক্তিযোদ্ধা বাবা। বিজ্ঞাপন দেখে জামিল মুক্তিযোদ্ধার ছেলে হিসেবে দরখাস্ত জমা দিতে যায়। কিন্তু বাবার মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট না থাকায় অফিস কর্মচারী দরখাস্তটি জমা রাখেনি। জামিল বুঝাতে চেয়েছে বাবা অভিমানে যুদ্ধপরবর্তী সময়ে হতাশা জর্জরিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেটটা ছিঁড়ে ফেলে। কিন্তু এতে বিশ্বাস করেনি অফিস কর্মচারী, তাই জামিল যে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সে প্রমাণ করার জন্য মুক্তিযোদ্ধা সংসদে ছুটে যায়। মুক্তিযোদ্ধা সংসদ থেকে প্যাডে লিখে দিলেও তা বিলায়েবল হয়নি অফিস কর্মচারীর কাছে। তারপর জামিলের বাবার যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু বর্তমানে মন্ত্রী তার স্মরণাপন্ন হলেও কাজ কিছুই হয়নি। অবশেষে বিডি-র সহযোগিতায় অফিস দরখাস্ত রাখতে বাধ্য হয়।

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্যাডে লিখিত বা জামিলের বাবা সরাসরি উপস্থিত হয়েও যা করতে পারেনি বিডি তাই করেছে অল্প সময়ে। অথচ তার বাবা দেশ স্বাধীন হবার কয়েকদিন আগে কোমরের কাছে গুলি খেয়েছে। মুক্তিযোদ্ধাও ছিলো বীরের মতো।

> তাই জামিল শ্লেষের সঙ্গে তার বাবাকে জানিয়েছে,
> "বাবা তুমি যে মুক্তিযোদ্ধা ছিলে, আমি যে
> মুক্তিযোদ্ধার ছেলে, তা ওরা বিডির কথায় বিশ্বাস করেছে।" পৃষ্ঠা ৮০

'কেউ জানে না" এবং 'পরাজয়' উপন্যাস দুটিতে নিগৃহীত মুক্তিযোদ্ধার পরিবার নিয়ে রচিত। কিন্তু উপন্যাসে পরিণতি এসেছে একাত্তরের পরাজিত শক্তির পুনরুত্থানে।

'পাথর সময়' এবং 'সতের বছর পর' উপন্যাস দুটি আবার সরাসরি মুক্তিযোদ্ধাদের দুটি পরিবেশ নিয়ে রচিত নয়। এই উপন্যাস দুটিতে একাত্তরের রাজাকার আল-বদরদের সতর বছরের পরের পারিবারিক ব্যবসায়িক দিক থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক ব্যবসা বানিজ্যের কথা উঠে এসেছে। এবং তাদের দ্বারা সমাজ ব্যবস্থা কিভাবে শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হচ্ছে তা মূর্ত হয়েছে।

'সতের বছর পর' উপন্যাসে গোলাম রব্বানী, বিডি এরাও ছিলো পাকিস্তানি সৈন্যদের দোসর। রাব্বানী ও বিডি ৭১-এ দুজনেই কাঝে ও মানসিকতায় ছিলো অভিন্ন। পাকিস্তান যেন টিকে থাকে এ ব্যাপারে চেষ্টার কমতি ছিলো না। তাছাড়াও পাকিস্তানি সৈন্যদের ক্যাম্পে বাঙ্গালি মেয়ে সংগ্রহ, অহেতুক কোনো বাঙ্গালিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে কথা বলতে দেখে তাকে খান সেনাদের হাতে ধরিয়ে দেয়া- সব কাজই এরা করেছে। দেশে স্বাধীন হবার প্রাক্কালে রাব্বানী ভয়ে পাকিস্তানে চলে যায়। আর বিডি এদেশেই থেকে যায়।

রব্বানী অবশ্য যেতে চায়নি। যদিও তার জন্মস্থান পাকিস্তান তবু পূর্ব পাকিস্তানে সে সেটেল হতে চেয়েছে। তার একটা কারণও ছিল সেটেল হবার- এখানে চাকুরী করলে প্রতাপ দেখানো ও কর্তৃত্ব করার মত সুযোগ এবং ক্ষমতা তার ছিলো। তাই পাকিস্তানে পালিয়ে গেলেও মন তার পরে আছে বাংলাদেশে। সে স্বাধীনতার সতর বছর পর ঘনিষ্ট আবদুল্লাহ্ সাঈদের রেফারেন্সে কুব ভয়ে বাংলাদেশে আসে। তার ভয় ছিলো হয়তো কেউ চিনে ফেলবে তাকে, তার অতীত কর্মকান্ড ফাঁস হয়ে গেলে বিপাকে পড়তে পারে।

কিন্তু এয়ারপোর্টে নেমে তার সে ভয় কেটে যায়। আবদুল্লাহ্ সাঈদ বাংলাদেশের যে লোকটির কাছে পাঠায় সে তাকে খুব খাতির যত্ন করে। নামকরা পাঁচতারা হোটেলে রাখে। ঘটনাক্রমে বিডির সাথে পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের পালা ধরে বাংলাদেশের যে অবস্থা তাতে দেখতে পায়- বাঙ্গালিরা- একাত্তরের কর্মকান্ড। রাব্বানীর একাত্তরের যে সব বন্ধু ছিলো এরাই টপ পজিশনে থেকে পাক্কা আমলা সেজে প্রশাসন চালাচ্ছে। একাত্তর-এ যারা পাকিস্তানের ফরে ছিলো তারাই সতর বছর পর একটি সফ্‌ট কর্ণার খুঁজে পাচ্ছে পরস্তরের মধ্যে। কোন গুরুত্বপূর্ণ সভা আলোচনা মসজিদ উদ্বোধন সব চালাচ্ছে আবার এরাই। উচ্চাভিলাষী জীবন যাপন করছে এরাই।

Dhaka University Institutional Repository

রব্বানীকে মাঝে মধ্যে একাত্তরের ভয়টা পেয়ে বসলেও স্বাধীন দেশে মুক্তিযোদ্ধারের যে ক্ষমতা নেই, ওরা সংগঠিত নয় তা পরক্ষনেই অনুভূতিকে সজাগ করে তোলে। উপরন্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সেমিনার থেকে শুরু করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আলবদর রাজাকারাই যে উদ্বোধন করে, প্রধান অতিথি হয়, করে পৃষ্ঠপোষকতা।

'পাথর সময়' এর "সে" একাত্তরের পরাজিত শক্তি। সে একাত্তরে ছিল রাকাজার। সে পাকিস্তানি খানসেনাদের খাদেমদারীতে বাঙ্গালী অনেক মেয়েকে উপহার দিয়েছে। কাঁচা টাকা কামিয়েছে। তার সহযোগী ছিলো বিডি অর্থাৎ ব্লাক ডায়মন্ড। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সতর বছর পর এরাই আবার একই স্থান দখল করে নিয়েছে। কালো টাকার পাহাড় জমাচ্ছে এরাই। এরাই বাংলাদেশ থেকে মেয়ে পাচার করছে বিভিন্ন দেশে। সমস্ত প্রশাসন আমলা মন্ত্রী যেনো ওদের হাতের মুঠোয়। ফলে তা মেয়ে রুম্পার চরম অধঃপতনেও ভীত নয়, 'সে' টাকা দিয়ে তা ম্যানেজ করার চেষ্ট করে। মুক্তিযোদ্ধা মাহমুদ তার একমাত্র ছেলে ইস্তিয়াককে তার সম্পর্কে অবগত করলে হোটেলে বিশেষ কায়দায় মাহমুদকে খুন করতে অসুবিধা হয়নি তার।

একটি বিষয় লক্ষণীয় য, রাজনৈতিক আদর্শের চাইতে একাত্তরের পরাজিত শক্তির অনেকেই ছিলো সুবিধাবাদী আদর্শের। ফলে এরা ব্যক্তিত্বের ধার ধারেনি। চাটুকারের মতো বেড়ে উঠেছে এই শক্তি। এরা সব জায়গায় পরিস্থিতি অনুযায়ী 'ম্যানেজ' করে নেয়ার মতো দক্ষ। একাত্তরের যারা পাকিস্তানাপন্থী ছিলো, যারা পাকিস্তানী সৈন্যদের মেয়ে জোগাড় করে দিতো তারা যে কেবল আদর্শিক এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসে করেছে, এমন নয়। এদেরদ ছিলো টাকা কামানোর উচ্চাভিলাষ। এরা অনেকেই ছিলো ক্রিমিনাল। স্বাধীনতা উত্তর সতর বছর পর মুক্তিযোদ্ধারা য সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে যথেষ্ট দূরে এবং সামাজিক কমিটমেন্ট পালনে ব্যর্থ তা নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস একই আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যারা যুদ্ধ করেছে তারাই স্বাধীনতা-উত্তর বিভ্রান্তি হয়েছে বিভিন্ন মতাদর্শে, রাজনৈতিক কুপমন্ডুকতায়। ফলে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন গড়ে উঠেছে একাধিক-আদর্শ বিচ্যুতির কারণে বিচ্ছিন্ন হয়েছে পরস্পর। 'কেউ জানে না' উপন্যাসে মঈনুল আহসান সাবের এ প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন,

> 'মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে এখন বেশ কয়েকটি ভাগ। বলতে গেলে স্বাধীনতার পর থেকে এই বিভক্তির সূচনা। অবস্থা দেখে মনে হয় কেউ পেছনে বসে কলকাঠি নেড়েছে, আর মুক্তিযোদ্ধারা বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়েছে। পৃঃ ৪২

এই প্রেক্ষিতে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিক্রিয়া ও শ্রেণী চরিত্রটি মূর্ত করেছেন তাঁর চারটি উপন্যাসে। ফলে সাহানা তার জমিটার ব্যাপারে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা সং সদের সহযোগিতা কামনা করলে সংসদ কর্তৃক বিবৃতি ছাড়া এর চাইতে বেশি কিছু পায়নি।

জাতীয় স্বার্থের চাইতে নিজের স্বার্থটাকে বড় করে দেখার জন্যেই একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা, রাজাকার মন্ত্রীর পাশাপাশি মন্ত্রীত্ব গ্রহন করছে। ফলে জামিল তার মুক্তিযোদ্ধা বাবার মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু এবং মন্ত্রীর কাছে নিজের জন্যে কৃপাপ্রার্থী হলে মন্ত্রী প্রতিক্রিয়াশীল মানসে জামিলের কাছে প্রস্তাব রেখেছে,

> আচ্ছা তোমার মতো ইয়ং ছেলেরা দেশের কাজ কেন করে না ? যেমন তুমি। তুমি আমাদেরা সঙ্গে কাজ করছো না কেন ? এখন তো সব বিভেদ ভুলে দেশ গড়ার সময়। 'পরাজয়' পৃঃ ৭৪

মুক্তিযোদ্ধারা ব্যক্তিস্বার্থ বড় করে দেখছে বলেই যেখানে বিডির কথায় অল্প সময়ের মধ্যে সাহানার সমস্যা সমাধান হয়ে যায়, সেখানে সাহানার শহীদ মুক্তিযোদ্ধা স্বামীর মুক্তিযোদ্ধা বন্ধু এবং মন্ত্রীর স্মরণাপন্ন হলে মন্ত্রী বিরাগভাজন হয়ে উক্তি করেছে-

Dhaka University Institutional Repository

> দেখুন সবার ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে আমি যদি ডীল করতে যাই, তবে ..... । তাছাড়া এটা আমার মিনিষ্ট্রিও নয়। আপনি কনসার্ন, আইমীন, সংশ্লিষ্ট লোক জনকে জানাচ্ছেন না কেন ? আর এটা একটা অফিস, এখানে জেকারাম বলে একটা ব্যাপার আছে, আপনি যেবাবে ঢুকলেন ... আমার বাসা হলে অবশ্য আমি মাইন্ড করতাম না।
>
> 'কেউ জানে না' পৃঃ ৫৭

ব্যক্তি স্বার্থকে সিদ্ধির তাগিদে একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা চাকরি নিয়েছে রাজাকারের অফিসে। 'পাথর সময় ' উপন্যাসে 'বিডি', 'সে'- এর সঙ্গে আলোচনা অবস্থায় বিডি এক প্রসঙ্গে একাত্তরের রাজাকার 'সে'-কে স্মরণ করিয়ে দেয়।

> "একটা ল্যাংড়া মুক্তিযোদ্ধা আর কি করবে বল" ? গাজী ফরহাদকে দ্যাখ না। সেভেন্টি ওয়ানে কিনা করলো পাকিস্তানের জন্য। এখন ওর অফিসে জানিস, সেদিন গুনে বললো, ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধা চাকরি করে। পৃঃ ৯৫

মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রীরা যে বিডিয়ারদের মতো রাজাকার দালালদের হাতে জিম্মি তারও একটি ওঠে "কেউ জানে না" উপন্যাসে। সাহানার কথা যে মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রী শোনেনি একদিন, সে মন্ত্রী বিডির কথা শুনেছে। সাহানার জমির ব্যাপারে বিডির গলা পেয়ে মন্ত্রী থানায় টেলিফোন করেছে এক পর্যায়ে মন্ত্রী প্রসঙ্গে সাহানা প্রশ্ন করলে (আমার কথা শুনলো না আপনার কথা শুনলো) উত্তরে বিডি জানিয়েছে ,

> শুনবে না মানে, লোকটাকে তো মন্ত্রী থাকতে হবে নাকি।('কেউ জানে না'পৃঃ ৭০)

আবার যে সব মুক্তিযোদ্ধা সৎ, ব্যক্তিস্বার্থকে বড় করে দেখে না, ওরা সমাজে ঠিকই নিগৃহীত হচ্ছে। এর জ্বলন্ত উদাহরণ 'পরাজয়'-এর জামিনের মুক্তিযোদ্ধা বাবা। 'পাথর সময় ' -এর মাহমুদ একজন আদর্শবান মুক্তিযোদ্ধা। সে এ প্রজন্মকে জানাতে চায় মুক্তিযুদ্ধ কি এবং কেন ? অথচ তাকেই 'সে' এবং বিডির সূক্ষ পরিকল্পনায় একটি আঘাতে নিহত হতে হয়। জামিলের াভিমানী মুক্তিযোদ্ধা বাবাকে মুক্তিযোদ্ধার সার্টিফিকেট অভিমানে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে- প্রয়াজনে তাকে, সে যে মুক্তিযোদ্ধা ছিল তা প্রমাণ করতে হয় একাত্তরের পরাজিত শক্তির সহায়তায়। এই অবস্থায় স্বাধীনতার মূল্যবোধের অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় চরমে পৌঁছে। শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিজন অবহেলিত পরিবেশের শিকার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিস্তেজ করার জন্যে নানা চক্রান্তের বেড়াজাল সৃষ্টি করছে, ধারণ করছে প্রলয়ংকারী রূপ, নানান মুখোশ। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্যও রার দায়ী। কেননা যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা ঋণদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তুলছে তার সাথে যোগসাজুয রয়েছে একাত্তরের বিরোধী অপশক্তির।

Dhaka University Institutional Repository

শিরীন মজিদের মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস

কথাশিল্পী শিরীন মজিদ বাংলা সাহিত্য অঙ্গনের এক উজ্জ্বল প্রতিভা। ঐতিহ্য চেতনা, সমাজ মনষ্টতা এবং রাজনৈতিক সচেতনার সুকুমার বহিঃপ্রকাশ তাঁর লেখায় সর্বত্র দেদীপ্যমান। তাঁর উপলব্ধির গভীরে মানুষ এবং সমাজের জন্য যে সমবেদনা সতত ক্রিয়াশীল,. তাঁর গল্প- উপন্যাস সে চেতনারই শিল্পমন্ডিত বানীরূপ। এই কথাশিল্পীর দেখা, জানা এবং অন্তর্ভেদী অনুভবের জগত তাঁকে সমকালীন অন্য লেখকদের থেকে পৃথক করেছে। তাই তাঁর প্রতিটি রচনাই সমাজ নির্ভর, ইতিহাস নির্ভর, সংযত সংহত অনিবার্য। তাঁর লেখা 'রক্তে আঁকা বাংলাদেশ', 'অবাক পৃথিবী' 'নন্দিনী থামো', 'মৃত্যুঞ্জী মুজিব', অথচ পবিত্র'- গ্রন্থগুলো আলাদা মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য ইতিমধ্যেই পাঠকমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

' "অপু বিজয় দেখেনি'"১৯৯০)- মূলত উপন্যাস হলেও, এই উপন্যাসে শিরীন মজিদ বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ -পরবর্তীকালের রক্তক্ষয়ী পরিবর্তন,বাংলাদেশের পশ্চাদযাত্রা, বাঙালীর স্বপ্ন-আশা ও আকাঙ্খার অপচয়কে নিপুন-নির্মোহ এক ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন- পূর্বে যা কখনো হয়নি।

' অপু বিজয় দেখেনি' সাম্প্রতিক রচনা। একাত্তরের আলো আঁধারের দিনগুলোতে যাদের জন্ম বাংলাদেশের সেই নতুন প্রজন্মের হাতে উৎসর্গ করেছেন এই উপন্যাস। এই উপন্যাসের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ এবং সেই সময়ে খানসেনাদের পৈশাচিকতার ফসল যুদ্ধ শিশু রিচার্ডকে নিয়ে, যুদ্ধপরবর্তী সময়ে অপুর নিঃসঙ্গতাও এখানে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ যুদ্ধে মা, বাবা, ভাই, বোন সবাইকে হারিয়েছে। যুদ্ধের রাতে বর্বররা প্রফেসর রাগীব চৌধুরীর বাসায় আক্রমণ করে তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করে, মেয়ে অনুকে ধর্ষণ করে হত্যা করে ছোট ছেলে নিশান্তকে হত্যা এবং তাকেও তা থেকে রেহাই দেয়নি। বড় ছেলে অপুকে আলমগীর পেছনে লুকিয়ে রাখতে প্রাণে বেঁচে যায়। অপু মায়ের আর্তনাদ, বোনের চীৎকার নীরবে সহ্য করেছে ঠিকই, কিন্তু এই অপমান, হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধ শেষে সে মায়ের কাছে ফিরে আসে। এসে দেখে মা সন্তান সম্ভবা। এই সন্তা প্রসবের সময়ই অপুরমা মারা যায়। অপু ক্রোধে শিশুটিকে হত্যা করতে চায়। কিন্তু শিশুটিতো নিস্পাপ। এক বিদেশী শিশুটিকে নিয়ে যায় নিজের দেশ স্কটল্যান্ডে। সেখানেই শিশুটি রিচার্ড নামে বড় হতে থাকে। রিচার্ড একসময় জানতে পারে সে এডাপ্টেড। সেখানে এক বাঙালী পরিবারের "সাথে তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। সে পরিবারের ডঃ রকিবের একমাত্র মেয়েকে সে ভালোবাসতো। সেই সূত্র ধরেই সে এক সময় বাংলাদেশে এসে তার আসল পরিচয় খুঁজে পায়। অপু রিচার্ডকে প্রথম মানতে পারেনি। পরে মায়ের ছায়া, নিশান্তর চেহারা যেন রিচার্ডের মাঝে দেখতে পায়। তখন তাকে কাছে টেনে নেয়।

অপূর্ব ছিল খাঁটি মুক্তিযোদ্ধা। অসীম সাহসী যোদ্ধা। '৭১'- সবাইকে হারিয়ে সে ছিল নিঃসঙ্গ, আবার যুদ্ধে সে পঙ্গুও হয়েছিল। তার এ নিঃসঙ্গতা অনেকটা কাটিয়েছে হিন্দু মেয়ে লক্ষী। যাকে সে দিদি বলে ডাকতো। লক্ষী ছিল বীরাঙ্গ না। বঞ্চনা, হতাশা, ঘৃনা, ক্রোধ নিয়ে অপু বেঁচেছিল। যুদ্ধে ভালোবাসার মানুষটিকেও হারিয়েছে। দোলা নামের মেয়েটি অপুকে নিঃশেষ করে দিয়েছিল পলে পলে। অপু দোলার প্রেমে এতই পাগল ছিল যে, দোলার বাবা রাজাকার হওয়া সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। অথচ অপু একজন শক্তিশালী যোদ্ধা। অপুকে যুদ্ধ করার প্রেরণা জুগিয়েছে তার মা। ছেলেকে বলেছে,

> তুই কখনও আমার সম্মুখে খালি হাতে ফিরে আসবি নে স্বাধীন দেশের পতাকা হাতে আমার কাছে ফিরে আসবি। এর আগে নয়। যা .....। কুঁচকে শুধু বললেন- পুরুষ মানুষের কাপুরুষের মত কান্নাকে আমি ঘৃনা করি, অপু ! (পৃঃ ২৪)

অপুর চিটি পেয়ে গ্রুপ লীডার কাদেরকেও অপুর মা হতো। অপুর মায়ের ছিল প্রতিশোধ নেওয়ার তীব্র বাসনা। প্রচন্ড ক্রোধে হয়তো ছেলেকে ঐ ধরণের কথা বলতে

Dhaka University Institutional Repository

পেরেছিলেন। অপুরও আকাঙ্খা ছিল তাই। লক্ষীকে তাই বলেছিল, 'বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিশান্তর হত্যার প্রতিশোধ। অনু ও মায়ের অপমানের প্রতিশোধ । সবকিছুর প্রতিশোদ নিয়েই অপু দীর্ঘ ন' মাস যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে বুকে আঁকড়ে ধরে রেখেছিল। যুদ্ধ শেষে অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছিল। লক্ষী বীরাঙ্গনায় ভূষিত হয়েছিল। সমাজে সবার কাছে নিজেকে ছোট মনে করে অবশেষে বিপথে পা বাড়িয়েছিল। সে পথ থেকেও লক্ষী ফিরে এসেছিল অপুর কাছে। অপুকে একটুকু মাতৃস্নেহ দেবার জন্যে। মাতৃস্নেহের অভাবে যার ভিতরটার ছিল শুধুই হাহাকার। গ্রুপ লীডার কাদেরও চলে গিয়েছিল ওয়েষ্ট জার্মানীতে। অথচ এই কাদেরের যার দেশের প্রতি ছিল গভীর মমত্ববোধ। দেশের জন্য যে প্রাণপন লড়েছে। সেই কাদেরই দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল। কাদের বদলে গেলেও অপুর প্রতি তার ভালোবাসার একটুও কমতি ছিল না। নিজস্ব বদলে গিয়ে ছিনতাই, রাহাজনিতে মেতে উঠেছিল। পরবর্তীতে তাকে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। অথচ অপু একটুও বদলায়নি। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে বুকে নিয়ে সময় পাড় করে দিচ্ছিল। সমস্ত স্মৃতি মনে হলে অপু আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। তবুও অপু মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ তেকে একটুকু বিচ্যুত হয়নি।

রিচার্ডেরও দেশের প্রতি ছিল গভীর টান। তার আত্মা যেন আগেই উপলব্ধি করতে পেরেছিল বাংলাদেশ তার মাতৃভূমি। তাই বুঝি ডঃ রকিবের বাসায় গিয়ে তার মেয়ে মৌকে ভালবাসতে পেরেছিল। বাংলাদেশের সংস্কৃতির সাথে মিশে গিয়েছিল। স্কটল্যান্ডে একটি ইংরেজ পরিবারে বড় হয়েও যার বাংলার প্রতি, বাংলার সাহিত্যের প্রতি ছিল ঝোঁক। অথচ রিচার্ড জানতো না সে এডাপ্টেড শিশু। ইংলিশ লিটারেচারের শিক্ষক মিঃ পিটারসনের পরিবারেই সে বড় হয়েছিল। বৃটিশ পরিবারভূক্ত হয়েও বাংলার সবকিছু সম্পর্কে জানবার পরে সে একবারও বাবার খোঁজ করতে চায়নি, জানতেও চায়নি। মায়ের রক্তের টানে ছুটে এসেছিল ডঃ রকিবের সাথে বাংলাদেশে। মা সম্পর্কে মৌকে বলেছিল,

> -------না মৌ তা নয়। তিনি যত বড় অন্যাডই করুক না কেন, তিনি আমার মা ! আমি খুঁজে বের করবো ওঁকে। সত্যি মৌ আমি মা-র ভালবাসা পেতে চাই। বলতে গিয়ে রিচার্ডের গলাটা ধরে এলো। পৃঃ (১২৬)

অপু যে রিচার্ডের ভাই তা জানার আগেই অপুর প্রতি ছিল তার দরদ মিশানো ভালোবাসা। এদেশ ছেড়ে যাওয়ার কথা মনে হলে কষ্টে তার বুকটা ভরে যেতো-,

> রিচার্ড উদাস কন্টে বলে, ওখানেও ত আমার কেউ নেই। তবুও বাংলাদেশে, কোথাও না কোথাও আমার মা আছে। অপু ভাইয়া আছে। এরা আমার অনেক কিছু মৌ। আমার কেবল মনে হচ্ছে-
> এদের ফেলে চলে গিয়ে আমি কষ্ট পাবো। সত্যি বড় কষ্ট পাবো। পৃঃ (১২৭)

ডঃ রফিকও সুপুর স্কটল্যান্ডের এডিনবরা হসপিটালে চাকুরী করলেও দেশকে তিনি ভালবাসতেন। মেয়েকেও সেই আদর্শেই গড়ে তুলেছিলেন।

'অপু বিজয় দেখেনি' উপন্যাসের নামকরণ যথার্থ হলেও অপু বিজয় দেখেছে, কিন্তু বিজয়ের আনন্দ উপভোগ করতে পারেনি। সবকিছুই যেন অপুর কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস

মুক্তিযুদ্ধে কিশোরদের ভূমিকাও কোন অংশে কম নয়। নানা সময়ে ও নানা পরিস্থিতিতে তারা যুদ্ধের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাসগুলো যেমন, আমজাদ হোসেনের "জন্মদিনের ক্যামেরা" (১৯৮৪) হুমায়ুন আহামদের 'সূর্যের দিন' (১৯৮৬) শওকত ওসমানের 'পঞ্চসঙ্গী' (১৯৯১), পান্না কায়সারের 'হৃদয়ে বাংলাদেশ' (১৯৯২), মাহমুদ আল জামানের 'যুদ্ধদিনের ধূসর দুপুর' (১৯৯২), রাবেয়া খাতুনের 'একাত্তরের নিশান' (১৯৯২), আনোয়ারা সৈয়দ হকের 'আগুনের চমক' (১৯৯২), রশীদ হায়দারের 'পুনজন্ম' (১৯৯২), সেলিনা হোসেনের সাগর' (১৯৯২), বিপ্রদাশ বড়ুয়ার 'যাদুমানিক স্বাধীনতা' (১৯৯১), রফিকুল নবীর 'সবখানেই যুদ্ধ' (১৯৯২), দাউদ হায়দারের 'রাজপুত্র' (১৯৯২), শাহরিয়ার কবিরের 'পূর্বের সূর্য' (১৯৯২), 'ভংকরের মুখোমুখি' (১৯৯৬), 'একাত্তরের পথের ধারে' (১৯৯৫), মঞ্জু সরকারের 'যুদ্ধে যাবার সময়' (১৯৯২), মমতাজ উদ্দীন আহামদের 'সজল তোমার ঠিকানা' (১৯৯৫), প্রভৃতি স্বাধীনতা উত্তর সময়ে রচিত।

জন্মদিনের ক্যামেরা (১৯৮৪) আমজাদ হোসেনের কিশোর উপন্যাস। অদ্বিত এমন সুন্দর হয়ে জন্মেছিল যে তার চেহারাটা সবা চেয়ে আলাদা। ১৯৬১ সালের ২৫শে মার্চ গ্রীনরোডের ডাক্তার ফিরোজা বেগমের ক্লিনিকের অদ্বিতের জন্ম হয়েছিল। অদ্বিতের বাবা ব্যবসায়ী কন্ট্রাক্টর। বাবার ইচ্ছে ছেলে কবি বা কথাশিল্পী হবে, না হয় চিত্রকর হবে। কারণ জন্মেই সে শিল্পী শিল্পী চেহারা পেয়েছে। কিন্তু মার ইচ্ছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবে।

অদ্বিত যখন হামাগুড়ি দেয়, তখন থেকেই সে খুব চঞ্চল প্রকৃতির। অনেক সময় হামাগুড়ি দিয়ে বাথরুমে ঢুকে যেতো। একদিনতো হামাগুড়ি দিয়ে মীরপুর মেইন রোডে চলে গিয়েছিল। অদ্বিতের চঞ্চলতার জন্যে অদ্বিতের দাদা-দাদী ওদেরকে গ্রামের বাড়ী নিয়ে যায়। সেখানেও সে অনেক অঘটন ঘটিয়েছে। অদ্বিতের বয়স যখন ছয় তখন তাকে কেজিতে ভর্তি করিয়ে দেয়। তখন শহরেই থাকে ঐ মীরপুরের বাড়ীতে।

একবার অদ্বিতের বাবা অদ্বিতকে নিয়ে যায় বন্যাদূর্গত এলাকার ছবি তুলতে। উদ্দেশ্য ক্যামেরায় কি করে ছবি তুলতে হয় তা ছেলেকে শেখানো। বেঁছে নিয়েছে বন্যা দূর্গত এলাকা। কিছু নষ্ট হলেও অদ্বিত চমৎকার ছবি তুলেছিল। বন্যা দূর্গত এলাকা থেকে আসার সময় অদ্বিত একটা কুকুর সাথে করে নিয়ে এসেছিল। নাম রেখেছিল ড্যানি।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ অদ্বিতের ১০ বৎসর পূর্ণ হয়েছিল। বাবা-মার ইচ্ছে ধুমধাম করে অদ্বিতের জন্মদিন পালন করবে। এদিকে দেশের পরিস্থিতি খারাপ। অসহযোগ আন্দোলন। প্রতিদিন হরতাল, কারফিউ। এর মধ্যেই অদ্বিতের বাবা জন্মদিনের কার্ড ছাপিয়ে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে নিমন্ত্রণ করেছিল। যাদের নিমন্ত্রণ করেছিল তারা বেশী কেউ আসেনি। যারা এসেছিল সবাই তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল।

জন্মদিনে অদ্বিতের বাবা অদ্বিতকে সুন্দর একটা ক্যামেরা উপহার দিয়েছিল। কিভাবে ওটা ব্যবহার করতে হয় তাও শিখিয়ে দিয়েছিল। ২৫শে মার্চ রাতেই স্টেনগান মর্টারের শব্দে সারা ঢাকা শহর কেঁপে উঠেছিল।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বাবার দেয়া ক্যামেরা দিয়ে আড়ালে, আড়ালে অনেক মূল্যবান ছবি তুলেছিল অদ্বিত। অদ্বিতের বাবা-মাকে যখন মিলিটারীরা টেনে-হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাদের শেষ ছবি তুলে রেখেছিল। কুকুরটা অদ্বিতকে অনেক সাহস করেছিল। পচা ড্রেনের মধ্যে অদ্বিত লুকিয়েছল ড্যানি তখন কামড় দিয়ে রুটি, বিস্কুট এনে দিয়েছিল। আবার অদ্বিত ছবি তোলার সময় ক্লিক শব্দ হওয়ার সাথে সাথে ড্যানি ঘেউ ঘেউ করে উঠতো। একবার মিলিটারী ক্যাম্পে এসে চোখ বাধা মানুষ, কেউ কাঁদছে, কেউ চুপ হয়ে আছে ঐ দৃশ্য দেখেছিল। তাদের সবাই বাঙালী ছিল। অদ্বিত নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। কারণ অদ্বিত ভেবেছে

Dhaka University Institutional Repository

অদ্বিত ভাবল - না ঃ এই মীরপুর এলাকা।
এখন এভাবে বেঁচে থাকাই ভালো। আমার
কোনো ভাষা নেই। আমি বোবা। কথা বলতে
পারি না। যেহেতু আমার মুখে কোনো কথা
থাকবে না সেহেতে আমি বাঙালি না বিহারী,
তা কেউ কোনদিন বলতে পারবে না। পৃঃ ৩১৬

কেউ কোন কথা জিগ্যেস করলে অদ্বিত হা করে তাকিয়ে থাকতো। এভাবে থেকেই সে মুক্তিযুদ্ধের অনেক মূল্যবান ছবি তুলেছিল।

একটা অসম্পূর্ণ বিল্ডিং-এ অদ্বিত ও ড্যানি উঠেছিল। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা একটা প্লাষ্টিকের ব্যাগে অদ্বিতের ক্যামেরা লুকিয়ে রেখেছিল। আর একটা গ্লাসের কৌটার ভিতরে কাগজ দিয়ে জড়িয়ে রেখেছিল একস্‌পোজড ফিল্মগুলো। এখানেই অদ্বিত খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। কারণ মিলিটারীরা যখন হাত-পা-চোখ বাধা লোকগুলোকে নদীর পাড়ে দাঁড় করিয়ে গুলি করছিল, তখন চুপিচুপি ছবি তুলতে যেয়ে ডান পায়ে গুলি খেয়েছিল অদ্বিত। গুলিটা বের হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসার অভাবে অদ্বিতের পায়ে পচন ধরেছিল। অদ্বিতের পানির প্রয়োজন হলে ড্যানি তাকে গ্লাসে কামড় দিয়ে পানি এনে দিত। টিনের গ্লাসটি ড্যানিই জোগাড় করেছিল। মানুষ যা পারে না কুকুরটি তাই করেছিল। অদ্বিতের পায়ের রক্তপুঁজ দুঁবেলা দুঁবেলা চেটে নিতো। যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়, অদ্বিত ও চিরকালের জন্য পৃথিটা থেকে চলে যায়। ড্যানি মুক্তিযোদ্ধাদের চিনতো। ঘেউ ঘেউ করে তাদের প্যান্ট-জামা ধরে টানলে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা কুকুরটির সঙ্গে যায়। পরে কুকুরটি তাদেরকে অদ্বিতের কাছে নিয়ে যায়।

ড্যানি অদ্বিতের ফিল্ম ও ক্যামেরা মুক্তিযোদ্ধাদের দেখিয়ে দিয়েছিল। অদ্বিতের বাড়ী চিনিয়ে দিয়েছিল। পরে মুক্তিযোদ্ধারা গ্রামের বাড়ী যেয়ে অদ্বিতের দাদু-দাদীর কাছ থেকে তার সম্পূর্ণ জীবনী জানতে পারে।

অদ্বিতের জন্য মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের অনেক মূল্যবান ছবি এদেশ পেল। পত্রিকায় অদ্বিতের জীবনী ছাপা হয়েছিল। এদেশ অদ্বিতকে মুক্তিযোদ্ধা বলে স্বীকৃতিও দিয়েছিল। দশ বছরের ছোট অদ্বিতের তোলা বিগত নয় মাসের ছবি দেখে দেশের মানুষ আশ্চয় হয়ে গিয়েছিল, অনেকে কেঁদেও ফেলেছিল।

অদ্বিত মানে যার কোন দ্বিতীয় নেই। তাই অদ্বিত সবার মাঝে অদ্বিতীয়। জাতির জন্য যে ছবি অদ্বিত উপহার দিয়ে গেছে, তার জন্য অদ্বিত স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এরকম বুদ্ধিমান, তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন কিশোর অন্য কিশোরদের তুলনায় সত্যিই ব্যতিক্রম, অদ্বিতীয়। মহাপুরুষদের জন্মের সময় যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, অদ্বিতের সময়েও তাই ঘটেছিল।

সূর্যের দিন (১৯৮৫) হুমায়ূন আহমেদের ছোট পরিসরের মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক কিশোর উপন্যাস। খোকন নামের ১৩ বৎসরের একটি ছেলে। যার বিকেল পাঁচটার আগেই বাসায় ফিরতে হয়। এটা ছিল বাড়ীর নিয়ম। খোকনরা ছয়বন্ধু মিলে একটা দল গঠন করেছিল। দলের নাম 'ভয়াল ছয়'। এদের প্রথম উদ্দেশ্য পায়ে হেঁটে আফ্রিকার গহীন অরন্য দেখতে যাওয়া। কিন্তু এদল থেকে অনেকেই চলে যায়। খোকনও শেষ পর্যন্ত এ দলে থাকতে পারে না। কারন বাড়ীর কঠিন নিয়ম। তাছাড়া তখন দেশের সার্বিক পরিস্থিতি খুব খারাপ। ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় মিছিল, লাঠিচার্জ। শেখ মুজিব ইলেকশনে জিতেছেন।, কিন্তু এটা পশ্চিম পাকিস্তান মানছে না। ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মূলতবী ঘোষনা করায় বাঙাগলীরা বীরদর্পে বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। অগনিত মানুষ দেখে সরকার সেদিন ৩টা কে কার্ফু ঘোষনা করে। খোকনের বন্ধু সাজ্জাত ও বল্টু আটকা পড়ে একটি বাড়ীতে। সে বাড়ীতে আছেন একজন বৃদ্ধ, যিনি চাকুরী থেকে অবসর প্রাপ্ত। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বাসায় আর ছিলো বৃদ্ধের নাতনী। কার্ফু শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে বাড়ীতেই

Dhaka University Institutional Repository

ওরা থাকে। বৃদ্ধকে ওরা বলতো 'দাদুমনি'। অত অল্প সময়েই ওদের সাথে সম্পর্ক আন্তরিক হয়ে ওঠে।

এদিকে খোকনের ছোট চাচা সেদিনই ৩টায় আমেরিকা থেকে আসেন স্বপরিবারে। এসে এয়ারপোর্টে আটকা পড়েন। মেয়ে অসুস্থ্য তারপরও বের হতে পারেন না। বিদেশীদের হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বাঙালীদের সে সুযোগ দেয়নি। স্ত্রী রাহেলা এই অবস্থায় বিরক্ত হয়ে আমেরিকা চলে যেতে চেয়েছিলো। কার্ফু শেষ হলে তারা বাসায় আসে। কয়েকদিনের মধ্যেই খোকনের অসুস্থ মামারা যান। খোকনের বড় চাচা মিঠিল, মিটিং এর পক্ষে ছিলেন না। খোকনের বন্দুদের এনিয়ে অনেক কথা বলেছে। তার ছেলে মিছিলে যায় বলে তাকে বাড়ীতে ঢোকা নিষেধ করেছিলো। কবীরও আর বাড়ীতে ফিরে না। বড় চাচা যে মিছিলের পক্ষে নয়, তা তার কথা থেকেই বুঝা যায়, সাজ্জাদকে বলেছে,

> শেখ সাহেবের যে পরিকল্পনা তাতে তো দেশটাই ছারখার হবে। পাকিস্তান আনার জন্যে আমরা কম কষ্ট করেছি ? এখন পাকিস্তানের কথা বলে না। সবাই শুধু বাঙালী বাঙালী করে। বাঙালী ছাড়াও তো লোক আছে। পাঞ্জাবী আছে, সিন্ধী আছে, এরা মানুষ না ? সবাইকে নিয়ে মিলেমিশে থাকা যায় না ?

বড় চাচা ছাড়া খোকনদের বাড়ীর আর সবাই ছিল বাঙালীদের পক্ষে, শেখ মুজিবের পক্ষে। দেশের পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার কারনে খোকনের ছোট চাচার আমেরিকা যাওয়া হয় না।

কার্ফুর প্রথম দিন সাজ্জাদের দুলাভাই সাজ্জাদকে খুঁজতে বের হয়েছিল। তিনি আর বাসায় ফিরেন নি। অনেক খোঁজাখুজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। সংসার চালানোর জন্য বোন তাকে অলংকার বিক্রি করতে দেয়। দুলাভাইয়ের অফিসে একটা চাকুরীও ঠিক হয়ে যায়। পড়াশুনার পাশাপাশি চাকুরি করবে। ওদের অবস্থা দেখে দাদুমনি এসে সাজ্জাদ ও ওর বোনকে তাদের বাসায় নিয়ে যায়। ঠিক হয় ওখানেই থাকবে। কারন নাতনীকে একা একা *কতে হয়*। পঁচিশে মার্চ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তানী মিলিটারীরা রাজার বাগ পুলিশ লাইন উড়িয়ে দেয়। জগন্নাথ ও ইকবাল হলের ছাত্রদের গুলি করে মারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হত্যা করে। এমন কি রাস্তার ধারের বস্তির সবাইকে নিঃশেষ করে দেয়। কারন,

> বাঙালীদের বেঁচে থাকা না থাকা কোন ব্যাপার নয়। এরা কুকুরের মত প্রানী, এদের মৃত্যুতে কিছুই যায় আসে না। এদের সংখ্যা যত কমিয়ে দেওয়া যায় ততই মঙ্গল। এদের মেরে ফেল এদের শেষ করে দাও। বর্বর পশুর মতো এরা সাড়া ঢাকায় ঘরে ঘরে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দেয়। দাদুমনি - নীলু, সাজ্জাদ ও তার বোনকে নিয়ে ময়মনসিংহ নীলগঞ্জে তাদের গ্রামের বাড়ীর উদ্দেশ্যে চলে যান। কিন্তু নীলগঞ্জের অবস্থা খারাপ দেখে তিনি ওদেরকে নিয়ে সুখান পুকুরে যান।

উপন্যাসের শেষে আমরা দেখতে পাই খোকন ও সাজ্জাদ মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলো। খোকনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। সাজ্জাদ গুলিতে নিহত হয়। লেখকের বর্ণনায়

,

> খোকন মে মাসের শেষদিকে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেবার জন্য বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।
> মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবার জন্যে একটি চৌদ্দ বছরের বালককে 'বীর প্রতীক' উপাধি দেওয়া হয়। মেথকান্দা অপারেশনে এই বালকটি শত্রুর গুলিতে নিহত হয়। তার নাম সাজ্জাদ । একবার এই ছেলেটি 'ভয়াল ছয়' নামের একটি ছেলে মানুষী দল গঠন করেছিল। এবং ঠিক করেছিল 'ভয়াল ছয়ের' সদস্যরা পায়ে হেঁটে আফ্রিকার গহীন অরন্য দেখতে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

পায়ে হেঁটে আফ্রিকার গহীন অরন্য দেখতে যাওয়া অবাস্তব হলেও তাদের এই মনোবল দেখে আমরা সহজেই বুঝতে পেরেছি তারা যে কোন কঠিন বা ভয়াল কাজ করার মানসিকতা রেখেছে। যার ফলে খোকন সাজ্জাদ বয়সে ছোট হলেও মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, যুদ্ধে তারা প্রাণ হারিয়েছে।

মানবিকতাবোধ থেকেই তাঁর উপন্যাসের সাধারণ ব্যক্তি হয়ে ওঠে অসীম সাহসী ও বিদ্রোহী। কোনো রাজনৈতিক আদর্শের মাপকাঠিতে এসব চরিত্রগুলোকে পরিমাপ করা যাবে না। আমরা জানি, মানুষের মন স্বভাবতঃ প্রতিবাদ প্রবণ। শৈশবে শাসন- নিষেধ অগ্রাহ্য করার মধ্যেই বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ ঘটে। বৈষম্য প্রতিবাদের জন্ম দেয়। কোথাও এতটুকু বৈষ্য, অসঙ্গতি অত্যাচার দেখলেই মানুষ তাই প্রতিবাদ মুখর হয়। এই প্রতিবাদ প্রবনতাই সময়ের ব্যবধানে বিক্ষোভ এবং তারও পরে বিদ্রোহে বিস্ফোরিত হয়।

শওকত ওসমানের 'পঞ্চসঙ্গীর' প্রারম্ভ ৬৮, ৬৯-এর উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশ এবং সমাপ্তি ৭১-এর ২৫শে মার্চের কালোরাত্রির নরহত্যার ভয়াবহতার সূত্রপাত দিয়ে। আউয়ুব শাহীবিরোধী আন্দোলন পূর্ববাংলায় যখন চরম আকার ধারণ করে, তখন রাস্তায় হোটেলে, পার্কে, ফুটপাতে, গ্রামে-গঞ্জে পূর্ববাংলার সমস্ত জায়গায় প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় রাজনীতি, বাংলাদেশের স্বায়ত্বশাসিত আন্দোলন। আইয়ুব শাহীবিরোধী প্রচারণা, শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মিথ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ব্যক্ত হয় বাঙালি জাতের সর্ব সাধারণের মনে। দেশবাসী, সকলের মুখে মুখে তখন জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো।, -এর সাথে আরো নানান ধরণের শ্লোগান। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র আসাদ শহীদ হয়। দেশে অহরহ জারী করা হয় কারফিউ মুক্তিকামী বাঙালি ছয় দফা ও এগার দফার ভিত্তিতে সভা করছে, ধর্মঘট আহবান করছে, নিয়মিত আসছে মিছিলে।

এই প্রেক্ষাপটে নিচুতলার ছিন্নমূল পাঁচটি কিশোর বংশির বাপ, বেলাল, নাজু আলী, জহুরের সংগ্রামী চেতনা কিভাবে যাপিত জীবনের সাথে মিশে যায় তা মূর্ত হয়ে উঠেছে।

পরাধীনতার যন্ত্রণা, রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যদিয়ে আত্মশক্তির উদ্বোধন এসব সম্পর্কে স্বচ্ছ কিংবা অস্বচ্ছ কোনো ধারনাই পঞ্চসঙ্গীর নেই। থাকার কথাও না তবে সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ দ্বারা এরা প্রভাবিত । এরা বুঝতে পারে বাঙ্গালি আর পাঞ্জাবিদের মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট। এরা অন্তত এইটুকুও বোঝে-শেখ মুজিব বাঙালির নেতা। আইয়ুব খান বাঙালিদের শোষণ করছে। রাস্তার পাশে স্তূপ করে রাখা ড্রেন তৈরীর পাইপের ভেতর বাস তাদের। বংশির বাপের কাছ থেকে অন্য চারজন কিশোর জানতে পারে দেশে আবারও কারফিউ দেয়া হবে। আইয়ুব খান নাকি ঘোষণা করেছে শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেবে। বাঙালিদের সোজা করে ছাড়বে। ঐ পরিস্থিতিতে ওরা ভাবে কারফিউ জারি করা হলে খাবার জুটবে কোথেকে ? সারাদিন খাবে কি ? এরা কখনও ভিক্ষার মাধ্যমে কোনো রকমে জীবন বাচায়। পেলে খায, না পেলে উপোষ দিয়ে দিন-রাত্রি পার করে দেয়।

অধিকার বঞ্চিত পঞ্চসঙ্গী উদ্বাস্থ জীবন যাপন করলেও ওরা মানবিক হরে ওঠে দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ের সাথে। হরতাল, কারফিউ, ধর্মঘট, মিটিং মিছিলে বাংলার আকাশ বাতাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হরতাল চলাকালে রাস্তায় পিকিটিং এর অংশ নেয় ওরা।

ওরা খবর রাখে পাঞ্জাবীরা এদেশের প্রচুর মানুষ মেরে চলছে, ক্রমেই বেড়ে চলছে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন থেকে উনসত্তর পর্যন্ত শহীদের সংখ্যা। তবু বাঙালিদের লড়াই শেষ হচ্ছে না আইয়ুব খানের বদলে ইয়াহিয়া খান পুনরায় মার্শাল নিয়ে রাষ্ট্রে আসন গেড়েছে। হয়তো বাংলাদেশের শোষণ থাকবে না। দেখতে দেখতে সময় গড়িয়ে আসে। ১৯৭১ সাল। মিলিটারীদের বিরুদ্ধে আবার বিক্ষোপ দানা বেঁধে ওঠে। ক্রমে তা ঝড়ের আকার ধারণ করে। রুখে দাঁড়ায় পাঞ্জাবিদের বিরুদ্ধে পুরো বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু পরিকল্পিতভাবে খান সেনারা ২৫শে মার্চের রাতের অন্ধকারে ইয়াহিয়া টিক্কার নীল নক্শা অনুযায়ী এক নারকীয় হত্যাকান্ডে মেতে ওঠে। ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহর অঞ্চল গুলিতে। এই হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বাঙালির বীরত্বপূর্ণ সাহসী প্রতিরোধে অংশ নেয়। রাস্তায় বড় করে গর্ত খোড়া হয়। গাছের টুকরো রাস্তার মাঝখানে ফেলে ব্যারিকেড সৃষ্টি করা, সংগ্রহ করা হয় ইটপাটকেল।

পঞ্চসঙ্গীরাও এই সাহসী সংগ্রামী চেতনা থেকে পেছনে সরে আসেনি। ওরা ইট হাতে খানসেনাদের পথ রোধ করতে পারেনি। খান সেনাদের ব্রাশ ফায়ারে ওরা নিজেরাই মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। তবে শেষ চিৎকার তারা জানিয়ে যায় বাংলাদেশের জয় সু-নিশ্চিত- 'জয়বাংলা' শ্লোগানের মধ্যদিয়ে। পঞ্চসঙ্গী পড়েছিল পাশাপাশি। কারফিউ দিয়ে রাস্তা থেকে লাশ সরাচ্ছিল পাঞ্জাবি সেনারা। একজন পাঞ্জাবীর চোখে প্রথম দলা পড়ে অল্পবয়সের পাঁচটি বালক একসঙ্গে মরে পড়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে ইটের টুকরো। ফলে অফিসারটি তখন বলতে বাধ্য হয়েছিলো- "বাঙালীদের কান্ড দেখো। এই কচি বাচ্চাগুলোকেও লড়াই করতে পাঠিয়েছে।

সেলিনা হোসেনের 'সাগর' উপন্যাসের নামকরণ মূলত ঃ কেন্দ্রিয় চরিত্র 'সাগর'-এর নাম থেকেই ধরা হয়েছে। উপন্যাস পাঠকালে প্রথমেই গ্রাম্য মূর্খ কিশোর সাগরের দুঃসাহসিক যুদ্ধাভিযান এবং বৃদ্ধি খাটিয়ে একটি রপর একটি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার দেখে সাধারণ পাঠকমলে নানান সংশং উত্থিত হতে পারে। তবে সকল শ্রেণীর সকল মতের মানুষের অনুভূতি খুবই তীক্ষ্ণ এটা স্বীকার করে নিয়ে সাগর চরিত্রটি বিশ্লেষণ করলে সাগরের চেতনার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করার মতো উপাদান খুঁজে পাওয়া যাবে, এতে সন্দেহ নেই।

সাগর কোনোদিন স্কুলে যায়নি। চাষাভূষার ছেলে সাগর স্কুলে গিয়ে কি-ই বা করবে এই ছিলো তাঁর বাবার ধারণা। কিন্তু সাগর বিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাঠ গ্রহন না করলেও প্রকৃতিগতভাবে প্রকৃতির পাঠ সে আয়ত্ব করতে পেরেছিল, অল্প বয়সেই তাঁর সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় উপন্যাসের প্রত্যেক পরতে পরতে। সেই কবে ার কলেজ পড়া মামা তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছিল সাগরের মতো বড় হবি। সেই স্বপ্ন সে লালন করেছে। সৃজনশীল বালক সাগর তাই মধ্যরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেলে স্বপ্নের পৃথিবী গড়ে। ঘটনাক্রমে সময়ের পট পরিবর্তন দেখে মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনের সূত্রপাত হলে সাগরের হৃদয়ের ভেতর ভাঙ্গন শুরু হতে দেখা যায়। সাগর ভাবতে শেখে জাতীয় পরিষদ কি ? দেশ কি? সবাই দেশের কতা ভাবে কেন, গ্রামের পড়লি ভাই আরিফ রাজধানী শহরে কলেজে পড়শুনা করে। সে বাড়ি এসেছে। সাগর ভাবে- আরিফের কাছ থেকেই জেনে নেবে ওসব। তাছাড়া সে শুনেছে রেডিওতে নাকি বঙ্গবন্ধু বলেছে- এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম।

শুনেছে যে, যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ঢাকা শহর মিলিটারী আক্রমণ করে হাজার হাজার নিরিহ ও মুক্তিকামী মানুষ মেরে ফেলেছে, রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে ঢাকা শহরে।

আরিফ তার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হুমায়ুন সাহেব ও হুমায়ুন সাহেবের স্ত্রীসহ তারের গ্রামের বাড়িতে সাথে করের নিয়ে আসে। শহরের ২৫ মার্চের কালোরাত্রির ধ্বংযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেছে তারা, শহর ছেড়ে তাই গ্রামে আসে বাঁচার লক্ষ্যে। আরিফদের বাড়িতে এসে হুমায়ুন সাহেব সাথী পেয়ে যান সাগরের মতো ছেলেকে। সাগর মূর্খ কিশোর হলেও তার সৃজনশীলতা হুমায়ুন সাহেবকে আকৃষ্ট করে দারুণভাবে।

হুমায়ুন সাহেব একা পর্যায়ে সাগরকে লেখাপড়া শেখানোর প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। হুমায়ুন সাহেব আরিফের বাড়ীতে অবস্থান নেয়ার পর সাগরও প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে বলে ওঠে - আমি সাগরের সঙ্গে থাকবো। স্যারের দেখাশুনা করবো। পৃঃ ৩৭

কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেও সে দ্বিধার দরোজায় থমকে দাঁড়ায় এবং ভাবনায় বলতে থাকে,

Dhaka University Institutional Repository

"ঢাকা শহরের মতো এই গ্রামেও যদি রক্তগঙ্গা বয়ে যায় তাহলে কি হবে ? কোথায় পালাবে মানুষ ? আরো দূরে ? আরো দূরে ? কত দূরে ? " পৃঃ ২৮

শহর থেকে পালিয়ে আসা অধ্যাপক গ্রামে অবস্থান নেয়ার পর স্বাধীনতার অপ্রতিরোধ্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। আরিফ তার মা-বাবাকে না বলে কেমল হুমায়ুন সাহেবের অনুমতি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। আরিফদের বাড়ীতে তেকেই হুমায়ুন সাহেব পরোক্ষভাবে অংশ নেন মুক্তিযুদ্ধে। তিনি এখানে মনস্থির করেন যে, শহরের অবস্থা দিন দিন খারাফ হচ্ছে। মানুষের বুকে ভয় আতংক। এই লেখাপড়া শেকার মধ্যদিয়ে মানুষের সাহস বাড়বে। হুমায়ুন সাহেব বর্ণমালা শিক্ষার মধ্যদিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেন 'অ'-তে অজগর , অজগর একটা বিশাল সাপ, ঐটা আমাদের জীবন নষ্ট করে। তাই অজগর আক্রমণ করলে এটাকে প্রতিহত করা উচিত।' আ'-তে আকাশ বা আমন ধান, ধান হলো আমাদের প্রাণ, এই ধান যদি বুলবুলিতে খেতে আসে তাহলে বাধা দেয়া উচিত।;'

গ্রামের কৃষকেরা সারাদিন মাঠে কাজ করার পর রাত্রিবেলা অবশ্য- নিজেদেরকে অর্থাৎ নিজেদের অস্তিত্বকে খুঁজে পেতে চেষ্টা করে এসবের মধ্য দিয়ে। সাগরও পায় যেন। সাগর মনে মনে আরো একটি জিনিস তৈরী করে নিয়ে বলে ওঠে 'আ'-তে আমার ও আমাদের হবে। এই আকাশ, আমন সব আমাদের। হুমায়ুন সাহেব সাগরকে এ ব্যাপারে প্রশংসা করে বলে যায়-ঠিক বলেছিস। চমৎকার কথা। তাহলে আকাশ আর আমন মিলে কি হয়? একটা দেশ হয়। এই দেশ আমাদের নিজেদের দেশ। জননী, জন্মভূমির চেয়ে বড় কিছু নেই। এই জন্মভুমির কোনো ক্ষতি হলে আমাদের রক্ষা করতে হবে। কৃষকরাও বুঝতে পারে, এজন্যই সমস্বরে সম্মতি জানায় দেশ রক্ষার্থে। সাগরেরও কেবল মনে হয় বাবার সঙ্গে ধান চাষ করা এক জিনিস কিন্তু ধান রক্ষা করা অন্য জিনিস। এর মধ্যদিয়ে সাগর সন্ধান পেয়ে যায় নিজের দেশের। দেশপ্রেম জাগ্রত হয় তার মধ্যে। প্রবল গতি সঞ্চার করে।

এরই মধ্যে গ্রামে মিলিটারী আসে। মিলিটারীরা গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। অবশেষে গ্রামের স্কুল ঘরে আস্তানা গড়ে তারা। গ্রামে ঢুকার পর পর সাগরের বন্ধু যাদু মিলিটারীর গুলিতে নিহত সাগর তা দেখতে পায়। এবং সাগরের আরো একটি বিস্ময়ের গিট খুলে যায়- সে বুঝতে পারে যাদু সমুদ্রের মতো কিভাবে বিশাল হয়ে গেলো ? যাদুর এই মৃত্যুতে সাগর প্রতিশোধ নেশায় মেতে উঠে।

একটা মৃত্যুর শোক ভুলতে না ভুলতেই অসহ্য মর্মপীড়া নিয়ে হাজির হয় হুমায়ুন সাহেবের মুত্যু। স্কুল মাঠে হুমায়ুন সাহেবসহ আরিফের বাবা হোসেন আলীকে আনা হয়। পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর গ্রামের দালাল ফালু মাতব্বরের সহযোগিতায় মিলিটারী জানতে পারে হুমায়ুন গ্রামে এসে মুক্তিবাহিনীর স্কুল খুলেছে এবং হোসেন আলীর ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে। হোসেন আলী বেদম মার খেয়ে প্রাণে রক্ষা পেলেও হুমায়ুন সাহেব প্রাণ বাঁচাতে পারেননি।

হুমায়ুন সাহেবকে মেরে স্কুল মাঠে ফেলে রাখা হয় এবং ঘোষণা করা হয় শেয়াল শকুনকে দিয়ে লাশটা খাওয়াবে। কিন্তু ট্রেনিংবিহীন কিশোর মুক্তিযোদ্ধা সাগর দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় - লাশটি শেয়াল শকুনের হাত থেকে যে কোনো প্রকারে রক্ষা করবে। অবশেষে রাতের পর রাত জেগে ওর বন্ধদের সহযোগিতায় গুলতি নিয়ে জঙ্গলের আড়ালে অবস্থান নেয়। যেই শিয়াল এবং শকুন আসতে শুরু করে অমনি গুলতি দিয়ে তাড়ানোর ব্যবস্থা করে। তিনদিন কোনো শেয়াল শকুনের ছায়া না দেখতে পেয়ে মেজর লাশটি মাটি চাপা দেয়ার নির্দেশ দেন।

হুমায়ুন সাহেবের শহীদ হওয়ার মধ্যদিয়েও সাগর অনুভব করতে পারে, স্বাধীনতা এক অপ্রতিরোধ্য চেতনা, সাগর উপলব্ধি করতে পারে, কিভাবে - সমুদ্রের মতো বড় হওয়া যায়। সে

Dhaka University Institutional Repository

উপলব্ধি করতে পারে, যাদুও সমুদ্রের মতো বড় হয়েছে। হুমায়ুন সাহেবও সমুদদ্রর মতো বিশাল হয়েছে। এরপর সাগরের বুদ্ধির কাছে চারজন সৈনিক পানিতে ডুবে নিহত হয়। আবার চারজন সৈনিকের পানিতে ডুবে মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সন্দেহবশত চারজন তরুণও মাঝি বশির মিলিটারীর হাতে ধরা পড়ে শহীদ হলেও তখনও সাগর উপলব্ধি করতে পারে ওরাও সমুদ্রের মতো বড় হয়েছে। তবে বশির মাঝিসহ ৪ জন তরুণের মুত্যুতে সাগর নিজেকে অপরাধী ভেবেও নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে- মৃত্যু ছাড়া কি স্বাধীনতা পাওয়া যায়। স্বাধীনতার অপ্রতিরোধ্য চেতনা সাগরকে সংগ্রামী করে তুলেছে -ফলে সেতার বোন দিঠির প্রশ্নের জবাবে উত্তর করেছে- স্বাধীনতার জন্য আমি আরো নিষ্ঠুর হতে চাই। কিংবা মিলিটারীর কনভয় ধ্বংসা করার জন্য যখন সে নিজেকে সম্পূর্ণ করতে চেয়েছে আরিফের কাছে তখনও সে বলে উঠেছে-স্বাধীনতার চেয়ে আমার জীবনটা কি বড় আরিফ ভাই? আমি আমার দেশের জন্য এই একটি কাজ করতে চাঙ্গ পরিনতিতে সে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে গিয়ে বুকে পিটে মাইন বেঁধে মাপিয়ে পরে যথার্থ ভাবেই সে তা প্রমাণ করেছে। অবশ্য জাপিয়ে পড়ার আগে আরিফকে তার দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রতীকী নিশ্চয়তা প্রদান করে গেছে - "আরিফ ভাই বাবা মাকে বললেন যে সাগর হারিয়ে যায়নি। ও বাবুই পাখির বাসা খুঁজতে গেছে।" পৃঃ ৮১।

সেলিনা হোসেনের এই কিশোর উপন্যাসে আরো একটি বিশেষ দিক লক্ষণীয় যে, স্বাধীনতার অপ্রতিরোধ্য চেতনায় শুধু ট্রেনিং প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাই পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করেনি। সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছে ট্রেনিং বিহীন বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষ (কিছু সংখ্যক স্বাধীনতার বিরোধী-বাঙালি ব্যতীত)। যুদ্ধ যে ট্রেনিং ছাড়াও হয়, চেতনা দিয়ে করা যায় - তা নিখুঁতভাবে চিত্রিত করেছেন সেলিনা হোসেন।

মমতাজ উদ্দিন আহমদের 'সজল তোমার ঠিকানা'র মূল কাহিনী মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পনর বছর পর্যন্ত বিস্তৃত। সজল মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের ইতিহাসের অধ্যাপক হাবিবুর রহমানের গ্রামের বাড়িতে তিল তিল করে বড় হয়। বড় হয়ে রমজানদার কাছে জানতে পারে রহমান সাহেব মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকায় থাকতেন। ঢাকায় পুরানা পল্টনে রহমান সাহেবের একটি নিজস্ব বাসা ছিলো। সে বাসায় নীচতলায় ভাড়াটিয়া থাকতো মোহাম্মদ আলী হোসেন। আলী হোসেনের ছেলে স্বাধীনতা বিরোধী আলবদর বাহিনীর সদস্য ছিলো। সে লুটতরাজ করে বহু টাকা পয়সার মুখ দেখে। তার বাবাও তাকে সাহায্য করে, এ ব্যাপারে। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার কয়েকমাস পর আলী হোসেন গ্রামের বাড়ীতে চলে আসে। এখানে এসে সে শান্তি কমিটিতে যোগ দেয়। মুক্তি যোদ্ধাদের সন্ধান ও পাড়ার মেয়েদের পাকিস্তানী বর্বর সৈনিকদের হাতে সাপ্লাই দেওয়াই প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় রহমান সাহেবের ছেলে কাজল মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। এসময় কাজলের চাচাতো বোন পিতৃমাতৃহীন দোলাকে আলী হোসেনের ছেলে ফখরুজ্জামান বাসা থেকে উঠিয়ে নিয়ে যায় পাকিস্তানি সৈনিকদের উপহার দেয়ার জন্যে। কিন্তু দোলাকে আর ফেরৎ দেয়নি। ২৫ মার্চ পাকিস্তানী বর্বরবাহিনী অতর্কিতে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনে হামলা চালানো, সখিনা নামের মেয়েটি যে কাজলের স্ত্রী এবং সজলের মা হিসেবে পরিচিত, সে তার ভাইয়ের সাথে রাজারবাগের নিকটে অবস্থিত মামাতো বোনের বাসা থেকে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে কাজলদের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল। সখিনার বড় ভাইটি ছিলো কাজলের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া বন্ধু। সখিনা তাদের কাজলের দিনাজপুরের গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকায় এসেছিল বিয়ের ব্যাপারে, ঢাকায় তার বিয়ে হবার কথা ছিলো। কিন্তু ছেলেটি শহীদ হয় পাকিস্তানি সৈনিকদের হাতে। শহীদ হয় তার ভাইটিও।

কাজলদের বাসায় আশ্রিতা না হয়ে উপায় থাকে না। ইতোমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়। কাজল বাসায় আসে, এসে জানতে পারে, তার চাচাতো বোন দোলা নিখোঁজ। তাই সে দোলার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে । অন্যদিকে গ্রামে বসবাসরত রমজান দাদার ছিলো একটি বোবা মেয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈনিকদের হাত থেকে ইজ্জত রক্ষার জন্য শান্তি

Dhaka University Institutional Repository

কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান আলী হোসেনের কাছে রাখে মেয়েটিকে। কিন্তু আলী হোসেন একদিন সুযোগ বুঝে পাকিস্তানী ক্যাপ্টেনের হাতে তুলে দেয় মেয়েটিকে। বোবা মেয়ে তিনদিনের দিন ফিরে আসে। দেশ স্বাধীন হবার পর একটি ছেলে সন্তান জন্ম দিয়ে বোবা মেয়েটি মারা যায়। রমজান দাদা শিশুটিকে নিয়ে ঢাকায় রহমান সাহেবের বাসায় আসেন। রহমান সাহেব সখিনাকে শিশুটির মাতৃত্বের দায়ভার গ্রহণে সম্মত করান। সখিনাকে আশ্বাস দেয়া হয়, কাজল ফিরে এলেই তার সাথে কাজলের বিয়ে দেবেন। কিন্তু কাজল আর ফিরে আসে না। অবশেষে রহমান সাহেব অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে তার গ্রামের বাড়িতে চলে আসেন। এখানে থাকেন রহমান সাহেব, সখিনা, রমজান দাদা ও সজল স্বয়ং। সজল ঘটনাক্রমে আরো জানতে পারে, যে সখিনার কোলে সে মানুষ হচ্ছে, সেই সখিনা তার আসল মা নয়। বোবা মেয়েটিকে গর্ব থেকে যে শিশুটি জন্ম নিয়েছিল, সেই শিশুটি হচ্ছে সজল নিজেই। অবশ্য ততদিনে সজল ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কখনো কখনো প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। যেমন- সজল পাঠ্য বই সমাজ পড়তে গিয়ে উপলব্ধি করেছে যাঁর আহবানে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, তাঁর নামটির অস্তিত্ব নেই বইটিতে।

ফলে সে প্রসঙ্গক্রমে উচ্চারণ করেছে ,

মারে আমার সমাজ পাঠের বইটাতে আবোল
তাবোল কত মানুষের নাম আছে। কিন্তু
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নাম নাই কেন ?
বঙ্গবন্ধু না জাতির পিতা। পিতার নাম
ছাড়া দেশের কথা কেমন করে হয় ? পৃঃ১৯

শুধু তাই নয়, এই সবের উত্তর যখন তার মা সখিনা দিতে পারেনি তখন ক্ষোভে সে আরো অভিমানী হয়ে ব্যক্ত করেছে ,

তুই তো কিছুই জানিস না, বঙ্গবন্ধু নাই কেন তুই
জানিস না, আমার বাবা কোথায় গেল তুই
জানিস না, আমার ফুফুকে আলবদররা কেন
উঠিয়ে নিয়ে গেল আনিস না। আর আমি
তোর ছেলে, আমাকে তুই যেমন ভালবাসিস,
তেমনি আবার দূর ছাই করিস। তোর মনে
কী আছেরে মা। ও মা, এই যদি তোর মন
হয়, তাহলে আমিও কিন্ত একদিন একটা
ঘটনা করে চলে যাব। পৃঃ ২০

সখিনা যখন সজলকে ছেলে হিসাবে কিংবা সজল্ খন সখিনাকে নিজের মা হিসেবে মানিয়ে নিতে পারছিলো না, তখনই সজল নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে নিজেকে প্রশ্ন করের বিদ্রোহী সত্তায় পরিণতির দিকে এগুচ্চিল যেমন,

এ কেমন অস্তিত্ব তার। সে আর কেউ নয়। মা
সখিনার সংগে তার কোনো সম্পর্ক নেই।
দাদু হাবিবুর রহমান তার কেহ নন, যে
লোক মুক্তিযুদ্ধ করে ফিরে এসেছিলো
আবার চলে গেছে দোলা ফুফুর খোঁজে
সে লোকটি তার বাবা নয়। তা হলে এ জগতে
কে তার নিজের ? কাকে সে আপন করে
নিতে পারে ? কোথায় কে আছে তার ? পৃঃ ৩৯

এই ভেবে যখন নিজেকে আত্মঘাতী করে তুলতে চেয়েছিলো তখনই রমজান দাদা সামনে গিয়ে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বলেছিলো তার।

সজল ছোট থেকেই রহমান সাহেব ও রমজান দাদার আদর্শে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। মুক্তিযোদ্ধারা যে স্বাধীনতা এনেছে, তাঁরা যে শ্রদ্ধার পাত্র এবং রাজাকাররা যে দেশের শত্রু ছিলো তাও জানতে সে। ফলে রাজাকারদের বিরুদ্ধে একটা প্রচন্ড ঘৃনা তার মধ্যে জন্মাতে থাকে। এবং সে ঘৃনা থেকে তার মনোচেতনায় জাগ্রত হয় শত্রু হননের প্রেরণা।

যেমন,

Dhaka University Institutional Repository

সজল বলল, দাদু তুমি মোহাম্মদ আলী হোসেনকে
চেন ? শুনেছি সে তোমার ঢাকার বাড়ির নিচতলায়
ভাড়া থাকত। "

একদিন আলী হোসেন হঠাৎ করে নিহত হয়। পুলিশকেও তৎপর হতে দেখা যায় আলীর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্যে। আলীর হত্যাকারী যে সজল তা দ্রুত সনাক্ত হয়। সজল আলী হোসেনকে হত্যা করে গর্ববোধ করেছে। কিন্তু রেহাই পায়নি ফাঁসির মঞ্চ থেকে। যদিও তার মা সখিনার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে,

যদি রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করে হত্যাকারীরা থেকে
যায়, যদি জেলখানায় বন্দীদের হত্যা করে
খুনীরা সরকারী সুযোগ সুবিধা পায়, তাহলে
কেন, একজন রাজাকারকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী
বেঈমানকে হত্যা করে সজল পৃথিবীতে থাকবে না ? কেন ?
বাংলাদেশ কি বেঈমানদের আশ্রয় ? আমি মা, আমাকে উত্তর দাও।
কোথায় আছ কে ? আমাকে উত্তর দাও। আমি উত্তর নেব। পৃঃ ৪৭-৪৮

সখিনা নামের এই মা যেনো সমস্ত বাংলাদেশের মায়ের প্রতীকরূপে প্রতীয়মান আর সজলের চেতনা যেনো বর্তমান নতুন প্রজন্মদের চেতনাকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

সজল ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিলেও নতুন প্রজন্মদের জন্যে যে দৃষ্টান্ত রেখে গেছে তাতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বপ্নকে মার্জিত করে গেছে। স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকারদের পুনরুত্থান হলেও এরা যে সর্বকালের ঘৃণিত শক্তি, ঘৃনিত মানবসন্তান তা এ প্রজন্মে 'সজল তোমার ঠিকানা' পাঠে সহজেই জানতে পারবে।

মঞ্জু সরকার ' যুদ্ধে যাবার সময়'

মঞ্জু সরকারের 'যুদ্ধে যাবার সময়' উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্যে বাদল নামের কিশোর ও গেদা নামের এক অল্প বয়সী কামলা এবং বাদলের দাদা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান প্রমুখকে প্রধানরূপে পেলেও, উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের জীবনযাত্রা।

২৫ মার্চের কালো রাত্রি নেমে এলে, বাদল টের পায় বাঙালি জাতির জীবনে নেমে এসেছে একটি ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। বাদলের বাবা তার মা ও বোনসহ প্রাণে বাঁচার জন্যে চাকুরী রেখে গ্রামের বাড়ি চলে আসে। এখানে এসেই বাদলের ২৬ মার্চের পর তেকে স্বাধীনতা লাভের কয়েকদিন আগ পর্যন্ত রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার প্রসার ও বিকাশ ঘটার ইংগিত লক্ষণীয়। বাদলের প্রথমে গ্রামে এসে ধারণা জন্মে - বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে যে আন্দোলন চলছে, সে সম্পর্কে তা শহরের লোক যত জানে এবং যতটুকু সচেতন, ততটুকু জানে না গ্রামের লোকজন এবং সচেতনও নয়। দ্বিতীয়ত তার দাদা পাকিস্তানের কালালীতে মত্ত। তৃতীয়ত তাদের গায়ের মানুষ অধিকাংশ শেখ মুজিবের পক্ষে অর্থাৎ স্বাধীনতার স্বপক্ষে। কিন্তু তার দাদা ধনাঢ্য ব্যক্তি এবং শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ায় কেউই মুখ খুলতে পারে না। কেবলমাত্র বাদল ছাড়া। তবে তার দাদার চোখকে ফাঁকি দিয়ে অনেকেই আসে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনতে।

এখানে এসে বাদল কারো না কারো সাহচর্য খোঁজে। বাড়ির কাজের ছেলে গেদাকেই সে বিশ্বস্ত মনে করে। কারণ তার মন সব সময় ব্যাকুল হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে, রাজনীতি নিয়ে কারো সঙ্গে কিছু বলার জন্যে। শুধু তাই নয়- গ্রামবাসীরা সকলেই যখন মিলিআরীর নাম শুনেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়, ভয়ে কুঁকরে যায় তখন বাদল একা একা ভাবে,

আমি যদি মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারতাম। হাতে থাকত এমন একটা বোমা, যা ওদের ক্যাম্পে ছুড়ে দিলে সব মিলিটারী খতম। অপারেশনে কয়েকজন খানসেনা খতম করলে আমার নামটাও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে ফলাও করে বলবে। বাদল নামের ১৪ বছরের কিশোর মুক্তিযুদ্ধের হাতে দশজন খানসেনা খতম হয়েছে।
পৃঃ ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য এতো সব কল্পনা সত্যি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা খুব দ্রুতই দেখা দেয় তার মাঝে, গেদার মাধ্যমে বাদল জানতে পারে, গ্রামের কয়েকজন ছেলে মুক্তিবাহিতে নাম লেখানোর জন্যে ইন্ডিয়া যাবে। গ্রামের মেট্রিক ফেল করা ছাত্র অনন্ত, বেকার আম্বার, বয়স্ক আফসার চাচা, গেদা ও বাদল একসময় সিদ্ধান্ত নেয় - মুক্তিযুদ্ধের অংশ নেয়ার জন্যে বাড়ি ছেড়ে পালাবে। মায়ের কাছে একটি চিঠি লিখে পালিয়ে যায় সে। বাদল অবশেষে মাস খানেকের নিরুদ্দেশ জীবনের অবসান কাটিয়ে বাড়ি ফিরে আসে। বাড়ি ফিরলে গেদাকে না নিয়ে আসার জন্যে গেদার মা বাদলকে ধরে বসে। বাড়িতেই বাদলের সময় কাটতে থাকে। সে দেখতে পায়, আগের মত স্বাধীন বাংলা বেতার শোনার জন্য বাড়িতে লোকজন আর আসে না। তার দাদা মুক্তিযোদ্ধাদের কথায় কথায় দুষ্কৃতিকারী বলে গালি দেয়। সারাদেশের মত তাদের গ্রামেও সেই সব দুষ্কৃতিকারীদের খতম করার জন্যে পাকিস্তানীরা শান্তিতে থাকার জন্যে গঠন করা হয়েছে শান্তি কমিটি আর সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী। সে দেখতে পায় - বাঙালি হয়েও যারা পাকিস্তানের পক্ষে, তারা প্রকাশ্যে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। এবং রাজাকারের ক্যাম্প বসেছে বাজারের স্কুল ঘরে।

ঘটনাক্রমে বাদল তাদের গ্রামে রাজাকারদের ক্যাম্প অপারেশনে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করে। এখান থেকে কিছু রাজাকার পালাতে সক্ষম হয়। কিছু ধরা পড়ে। পাড়ায় রটনা হয়ে যায় গ্রামে মিলিটারী নেমেছে। কিন্তু পরে সবাই জানতে পারে বাদলের সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনীরা নেমেছিল রাজাকার ক্যাম্প অপারেশনে।

নভেম্বরের শেষ দিকে ভারতীয় মিত্রবাহিনী যুদ্ধে অংশ নেয়। ফলে দ্রুত গতিতে স্বানীতার পথ প্রশস্ত হয়। এক সময় বাদল দেখতে পায় ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশ হয়েছে শত্রুমুক্ত। মুক্তিযোদ্ধারা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে, দেশ আজ স্বাধীন।

একসময় তা দাদা- সহ বাদলরা শহরের মুখে রওনা হয়। কারণ তার দাদাকে আপাতত লুকিয়ে রাখতে না পারলে হয়তো মুক্তিযোদ্ধারা তাকে মেরে ফেলবে। যাবার আগে বাদলের মায়ের কাছ থেকে পাওয়া কিছু টাকা নিয়ে বাদল গেদার মার কাছে হাজির হয়। সেখানে গেদার মার কান্নাকাটি ও প্রশ্নের ফলে বাদল উত্তর করে- গেদা নেই, আমিতো আছি। এখন থেকে আমিত আপনার এক ছেলে। আমিও তো মুক্তিযোদ্ধা।

একাত্তরের নয় মাসের জীবনযাত্রার যেমনি রয়েছে ধ্বংসজ্ঞ ও নারকীয় হত্যাকান্ডের চালচিত্র, বীরত্বগাথা, তেমনি দেখা যায় আপোস, তীব্রতা, গ্লানির কলংকজনক পরিচ্ছেদ। এ যুদ্ধকে বিভিন্ন শিল্পী, সাহিত্যিক, নিরীক্ষণ করেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে।

রফিকুন নবীর, 'সবখানেই যুদ্ধ', উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে একাত্তরের পাঁচিশে মার্চ পাকবাহিনীর নিষ্ঠুর নিধনযজ্ঞের মুখে ঢাকা শহরের অন্য আরো অগণিত পরিবারের মতো একটি পরিবার পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে এক অজ পাড়াগাঁয়ে। যুদ্ধ সেখানকার মাটি ও মানুষকে স্পর্শ করে। এখানেও প্রতিরোধ যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং পরিশেষে বিজয় অর্জনের ছবি বিম্বিত।

মাহমুদ আল আমান ও আনোয়ারা সৈয়দ হক তাঁদের উপন্যাসে দক্ষ শিল্পীর বর্ণনায় চিত্রিত করেছেন একজন কিশোর ও কিশোরীর চোখে দেখা মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের জীবনযাত্রা এবং স্বাধীনতার এক অপ্রতিরোধ্য চেতনায় কিভাবে মানুষ অংশ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে।

আনোয়ারা সৈয়দ হক কিশোরী পায়রা'র অবলোকনের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে উপস্থাপন করেছেন- ছোট শহরে স্কুলছাত্রীরাও তাদের মতো করে মুক্তির লড়ায়ে অংশ গ্রহণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

মাহমুদ আল জামান তার কিশোরের অবলোকনের চিত্র তুলে ধরে দেখিয়েছেন একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির হৃদয় ছুঁতে পেরেছিল নির্মোহ ও নির্ভীকভাবে, ফলে উদ্বাস্তু সহস্র মানুষের মিছিলে বাঙালি মানুষকে মুক্তিপিপাসু নতুন উদ্দীপনায় জেগে উঠতে দেখা গেছে।

বিপ্রদাশ বড়ুয়া তাঁর উপন্যাসে বিশেষ করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের জীবন যাত্রায় স্বাধীনতার লড়াইয়ে মানুষের সম্পৃক্তি যে ছিলো নানান ধরণের, তা চিত্রিত করেছেন। এবং দেখিয়েছেন একজন গ্রামীন কিশোর শিমুল আলীও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গী হতে পারে। শিমুল আলী নামের এই কিশোর একসময় বীরত্বের সাথে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যায়।

উপন্যাসগুলো পাঠ করে নিঃসন্দেহে বলা যায়, বাংলাদেশের কিশোর সাহিত্যে বিষয়ের বৈচিত্র্য এসেছে, ঘটেছে বিষয়ের রূপান্তর। বিষয়ের রূপান্তরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কিশোর উপযোগী উপন্যাস সৃষ্টি, বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলিতে আমাদের ঔপন্যাসিকদের একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তাদেরকেই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছেন, যারা সংকটের সময়ে- নিজেদেরকে গুটিয়ে নিতে তৎপর। একথা সত্য বটে মধ্যবিত্তের একটি অংশ এমনিভাবে সংকট থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে দেশের সমগ্র মানুষ, যাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক মানুষও ছিলো, নিজেদেরকে গুটিয়ে নেয়নি, উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলো এটাও সত্য এবং প্রকৃত সত্য।

শহীদ আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহিন চোখের সামনে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ঘটতে দেখেন। তিনি জানেন এবং চান আক্রমণকারীদের পরাভব। কিন্তু বন্ধু, সহকর্মী এবং নিরীহ মানুষের অগনিত মৃতদেহ দেখে তিনি শারীরিক এবং মানসিকভাবে সংকুচিত হয়ে পড়েন। স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে ছুটে বেড়ান নিশ্চিত আশ্রয়ের জনে। শহরের একটি অচেনা বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে জানতে পারেন মুক্তির দূতেরা সংগঠিত হচ্ছে, একজন সাধারণ মহিলার আশ্রয়ে। তিনি আশান্বিত হয়ে ওঠেন, কিন্তু এর বেশী কোনো কিছু তাঁর করার থাকে না।

অনুরূপ জনৈক অধ্যাপকের সাক্ষাৎ মেলে ১৯৭২ সালে রচিত শওকত আলীর 'যাত্রা উপন্যাসে। অধ্যাপক রায়হান ছিলেন এককালে প্রগতিশীল রাজনীতির সক্রিয় সদস্য। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ে নেতৃত্ব দেবার সুযোগ এলেও তিনি মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারেন না। স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে নিরাপত্তা আর পুরানো স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে ফেরেন। মধ্যবিত্তের এই মানুষরূপ আরো স্পষ্ট দেখতে পাই রশীদ হায়দারের 'খাচায়' উপন্যাসে অধ্যাপক তাহের সাহেবসহ আরো কয়েকজন মানুষ একটি ত্রিতল ফ্ল্যাটে শ্বাস-রুদ্ধকর পরিবেশে সর্বক্ষণ মুক্তির প্রত্যাশা করেন। ভারতীয় বিমান-বাহিনীর বিমানকে মনে হয় মুক্তির দূত, ইন্দিরা গান্ধীর বেতার ভাষনে তারা তাদের স্বাধীনতার আশ্বাস খোঁজেন। তারা সবাই মুক্তি চায়, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ থেকে তাদের অবস্থান অনেক দূরে। কখনো তাস খেলে, চা-কফি পান করে, ঘন ঘন রেডিও শুনে, ভয়-ভীতিতে মৃত প্রায় মানুষ কজন মুক্তির দিনগুনে। মাহমুদুল হকের 'জীবন আমার বোন' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত যুবকেরা চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে রাজনৈতিক সংকটের স্বরূপ এবং ভাবী পরিণতি নিয়ে তর্ক করে। সবাই নিশ্চিন্তভাবে উপলব্ধি করে সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে - বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। তবে সকলেই সংকট থেকে দূরে, নিশ্চিত আশ্রয়ে চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাদের কেউ আবার রাজনৈতিক গোলযোগের ডামাডোলকে গালাগাল করে। হাসনাত আব্দুল হাইয়ের 'তিমি' উপন্যাসের রেবেকা যুদ্ধের বর্ণনা করে সে শিহরিত হয়, সেখানকার 'টয়লেটের দুর্দশার কথা ভেবে তার মনে হয়' এর চেয়ে হানাদারদের কাছে রেপড হওয়াও বৈধ হয় কম বিভীষিকাময় ছিলো।'

আবার সেলিনা হোসেনের 'হাঙরনদী গ্রেনেড' উপন্যাসের সলীম শহুরে মধ্যবিত্ত অথবা মধ্যবিত্ত নয় বলেই স্ত্রী, শিশুপুত্র, বৃদ্ধা মাকে পেছনে ফেলে সহজেই যুদ্ধে চলে যায়।

মধ্যবিত্ত মানুষও স্বশ্রেণীর সমাজভূমি থেকে নিজের শেকড় ছিঁড়ে গেলে কি অভাবিত মাত্রায় বেড়ে উঠতে পারে, মধ্যবিত্তের মানসসীমা অতিক্রম করে অসামান্য সম্ভাবনায় দীপ্তিমান হতে পারে, তার দৃষ্ঠান্ত মেলে সৈয়দ শামসুল হকের 'নিষিদ্ধ লোবান' এবং 'নীল দংশন' উপন্যাস দুটিতে। পাকিস্তানী সৈনিকেরা বাঙালীদের মৃত্যুদেহ দাফন না করার ঘোষণা দিয়ে অজস্র মৃতদেহ শেয়াল কুকুরের জন্যে ফেলে রাখে, পশু আর বাঙালী জাতিকে এক প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে। কেননা পশুদের দাফন হয় না। বিলকিস এই অপমানের প্রতিবাদ জানায় অসম্ভব এবং অভাবনীয় এক প্রক্রিয়ায়, প্রতিশোধ নেয় আরো অসম্ভব পদ্ধতিতে' 'মশালের মতো প্রজ্জ্বলিত সমস্ত শরীর দিয়ে।' তেমনি একজন সাধারণ নজরুল ইসলাম পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে স্ত্রী সন্তানের কাছে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল ও শংকিত হয়ে পড়লেও সে মিথ্যে কবি কাজী নজরুল সেজে মুক্তি পেতে চায়না। শেষে অবিরত অমানসিক পীড়নে সে বিদ্রোহ করে নিজের অজান্তেই বৈসরকারী অফিসের এক কেরানী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে যায়। কঠোর কন্টে

Dhaka University Institutional Repository

বলে 'হ্যাঁ আমি কবিতা লিখতে চাই' তবে তোমাদের জন্যে নয়।' সমালোচক আবু হেনা মোস্তফা কামাল যথার্থই লক্ষ্য করেছেন বিলকিস ও নজরুল ইসলাম 'যতটা অতিমাত্রিক হয়ে উঠে ব্যক্তি হিসেবে ততোটা স্বশ্রেণীর সম্প্রসারণ হিসেবে নয়।'

উল্লেখিত উপন্যাস সমূহে ছড়িয়ে আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ, তবে এর কোনটিই মুক্তিযুদ্ধের সময় সম্মিলিত বাঙালির চৈতন্যের জাগরনকে যথাযথ ভাবে অঙ্গীভূত করতে পারেনি। এর কারণ বহুবিধ প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধ-প্রসঙ্গে আমাদের ঔপন্যাসিকদের ধারণা। তাই মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে তাদের উপন্যাস সমূহেও নেই প্রত্যক্ষ উত্তাপের স্পর্শ। অধিকাংশ উপন্যাসই স্মৃতিচারণমূলক, কল্পনানির্ভর কিংবা আবেগ - উচ্ছাসের মনোময় কথকতা। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধোত্তর জাতীয় হতাশা আর বিপর্যয় থেকে উজ্জ্বল উত্তরণের দিকে পথ নির্দেশ নয় বরং সর্বব্যাপী হতাশা আর 'নিখিল নাস্তি'র গর্ভে বিলীন হতে চাইলেন আমাদের ঔপন্যাসিকরা এবং এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের অনিঃশেষ অবিনাশী চেতনা খন্ডিত ও বিপথগামী হলো। তৃতীয়ত, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বল্প স্থায়িত্ব এটিকে যথার্থ জনযুদ্ধে পরিণত হতে দেয়নি, ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও হয়নি সর্বব্যাপ্ত এবং এরই শিকার, অধিকাংশ বাঙালির মতো, বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরাও। এ কারণেই একটি স্বাধীন জাতির সুদূরস্পর্শী স্বপ্ন ও পরিকল্পনা শিল্প-সাহিত্যে যথার্থভাবে হলো না রূপায়িত। চতুর্থত, এবং সম্ভবত এটিই প্রধান কারণ, মুক্তিযুদ্ধ এখনো অত্যন্ত কাছের একটি ঘটনা এবং এ-জন্যই অধিকাংশ ঔপন্যাসিকদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আবেগ উচ্ছাস তাড়িত, সেখানে স্বভাবই ফুটে ওঠে শৈল্পিক নিরাসক্তির অভাব। এ প্রমঙ্গে উল্লেখ্য নেপোলীয়নীয় যুদ্ধের (১৮০৪-১৮১৫) অনেক পরেই রচিত হয়েছে লিও তলস্তয়ের কালোত্তীর্ণ মহাকাব্যিক উপন্যাস 'ওয়ার এন্ড পীস' (১৮৬৫-৬৮) গৌবরোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিকতাকে ধারণ করে, রচিত, বাঙালি জাতিসত্তার সম্মিলিত উজ্জীবনের মর্মমূল উৎসারিত, কালজয়ী মহাকাব্যিক উপন্যাসের জন্যে সম্ভবত আরও কিছু কাল অপেক্ষা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচিত গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। 'রাইফেল রোটি আওরাত'-আনোয়ার পাশা (চতুর্থ সং)-সেপ্টেম্বর,১৯৯০ ইং

২। 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' - শওকত ওসমান, মুক্তধারা,ঢাকা-১৯৭১

৩। 'নেকড়ে অরন্য'- শওকত দ্বিতীয় প্রকাশ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা-১৩৯৮

৪। 'নিষিদ্ধ লোবান-' সৈয়দ শাসসুল হক, ,অনন্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯০

৫। 'নীল দংশন- সৈয়দ শামসুল ,শ্রেষ্ঠ্য উপন্যাস' বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা-১৯৯০

৬। 'খাঁচায়'- রশীদ হায়দার, (দ্বিতীয় সং) মুক্তিধারা, ঢাকা-১৯৯৭

৭। 'মুক্তিযুদ্ধে উপন্যাস সমগ্র'- আমজাদ হোসেন।

৮। 'হাঙর নদী গ্রেনেড' - সেলিনা হোসেন, দ্বিতীয় সংস্করণ মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৮৪।

৯। 'শ্যামল ছায়া'- হুমায়ুন আহমদ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

১০। 'আগুনের পরশমনি'- ষষ্ঠ প্রকাশ - ১৯৯৫

১১। '১৯৭১'- আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৫

১২। 'সূর্যের দিন' - জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, নবম প্রকাশ, ঢাকা (১৯৮৫)

১৩। 'কেউ জানে না' - মইনুল আহসান সাবের, পল্লব পাবলিকার্স, ঢাকা-১৯৯৪

১৪। 'মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র- ইমদাদুল হক মিলন, অনন্যা , ঢাকা-১৯৯৩

১৫। অপু বিজয় দেখেনি - শিরীন মজিদ প্রথম প্রকাশ - ১৯৯০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। বাংলাদেশের সাহিত্য - বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯১

২। বাংলা উপন্যাস ঃ সেকাল-একাল-সারোয়ার জাহান, বাংলা একাডেমী।

৩। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য - ডঃ রফিকুল ইসলাম, নতুন প্রকাশ।

৪। স্বাধীনতা উত্তর সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব - আবুল কাশেম ফজলুল হক, /সাহিত্য চিন্তা', বাংলা একাডেমী।

৫। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস - শাহীদা আখতার, বাংলা একাডেমী।

৬। বাংলাদেশের কবিতা ও উপন্যাস - মুক্তিযুদ্ধের চেতনা - আমিনুর রহমান সুলতান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭। ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আহমেদ এবং 'আগুনের পরশমনি' - সরদার আবদুস সাত্তার, ৮ই ডিসেম্বর' ৯৮ দৈনিক ইত্তেফাক।

৮। 'ইমদাদুল হক মিলনের কথাসাহিত্য' - আহমেদ মওলা, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

৯। মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস 'রক্তের অক্ষর' - মাহমুদুল বাসার, ঢাকা বৃহস্পতিবার ১০ মাঘ ১৪০৩, আজকের কাগজ।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলিতে আমাদের ঔপন্যাসিকদের একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তাদেরকেই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছেন, যারা সংকটের সময়ে- নিজেদেরকে গুটিয়ে নিতে তৎপর। একথা সত্য বটে মধ্যবিত্তের একটি অংশ এমনিভাবে সংকট থেকে পালিয়ে যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু যুদ্ধের সময়ে দেশের সমগ্র মানুষ, যাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক মানুষও ছিলো, নিজেদেরকে গুটিয়ে নেয়নি, উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিলো এটাও সত্য এবং প্রকৃত সত্য।

শহীদ আনোয়ার পাশার 'রাইফেল রোটি আওরাত' উপন্যাসের অধ্যাপক সুদীপ্ত শাহিন চোখের সামনে নারকীয় হত্যায়জ্ঞ ঘটতে দেখেন। তিনি জানেন এবং চান আক্রমণকারীদের পরাভব। কিন্তু বন্ধু, সহকর্মী এবং নিরীহ মানুষের অগনিত মৃতদেহ দেখে তিনি শারীরিক এবং মানসিকভাবে সংকুচিত হয়ে পড়েন। স্ত্রী এবং সন্তানদের নিয়ে ছুটে বেড়ান নিশ্চিত আশ্রয়ের জনে। শহরের একটি অচেনা বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে জানতে পারেন মুক্তির দূতেরা সংগঠিত হচ্ছে, একজন সাধারণ মহিলার আশ্রয়ে। তিনি আশান্বিত হয়ে ওঠেন, কিন্তু এর বেশী কোনো কিছু তাঁর করার থাকে না।

অনুরূপ জনৈক অধ্যাপকের সাক্ষাৎ মেলে ১৯৭২ সালে রচিত শওকত আলীর 'যাত্রা উপন্যাসে। অধ্যাপক রায়হান ছিলেন এককালে প্রগতিশীল রাজনীতির সক্রিয় সদস্য। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ে নেতৃত্ব দেবার সুযোগ এলেও তিনি মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারেন না। স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে নিরাপত্তা আর পুরানো স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে ফেরেন। মধ্যবিত্তের এই মানুষরূপ আরো স্পষ্ট দেখতে পাই রশীদ হায়দারের 'খাচায়' উপন্যাসে অধ্যাপক তাহের সাহেবসহ আরো কয়েকজন মানুষ একটি ত্রিতল ফ্ল্যাটে শ্বাস-রুদ্ধকর পরিবেশে সর্বক্ষণ মুক্তির প্রত্যাশা করেন। ভারতীয় বিমান-বাহিনীর বিমানকে মনে হয় মুক্তির দূত, ইন্দিরা গান্ধীর বেতার ভাষনে তারা তাদের স্বাধীনতার আশ্বাস খোঁজেন। তারা সবাই মুক্তি চায়, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ থেকে তাদের অবস্থান অনেক দূরে। কখনো তাস খেলে, চা-কফি পান করে, ঘন ঘন রেডিও শুনে, ভয়-ভীতিতে মৃত প্রায় মানুষ কজন মুক্তির দিনগুনে। মাহমুদুল হকের 'জীবন আমার বোন' উপন্যাসে মধ্যবিত্ত যুবকেরা চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে রাজনৈতিক সংকটের স্বরূপ এবং ভাবী পরিণতি নিয়ে তর্ক করে। সবাই নিশ্চিন্তভাবে উপলব্ধি করে সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটবে - বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। তবে সকলেই সংকট থেকে দূরে, নিশ্চিত আশ্রয়ে চলে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাদের কেউ আবার রাজনৈতিক গোলযোগের ডামাডোলকে গালাগাল করে। হাসনাত আব্দুল হাইয়ের 'তিমি' উপন্যাসের রেবেকা যুদ্ধের বর্ণনা করে সে শিহরিত হয়, সেখানকার 'টয়লেটের দুর্দশার কথা ভেবে তার মনে হয়' এর চেয়ে হানাদারদের কাছে রেপড হওয়াও বৈধ হয় কম বিভীষিকাময় ছিলো।'

আবার সেলিনা হোসেনের 'হাঙরনদী গ্রেনেড' উপন্যাসের সলীম শহুরে মধ্যবিত্ত অথবা মধ্যবিত্ত নয় বলেই স্ত্রী, শিশুপুত্র, বৃদ্ধা মাকে পেছনে ফেলে সহজেই যুদ্ধে চলে যায়।

মধ্যবিত্ত মানুষও স্বশ্রেণীর সমাজভূমি থেকে নিজের শেকড় ছিঁড়ে গেলে কি অভাবিত মাত্রায় বেড়ে উঠতে পারে, মধ্যবিত্তের মানসসীমা অতিক্রম করে অসামান্য সম্ভাবনায় দীপ্তিমান হতে পারে, তার দৃষ্ঠান্ত মেলে সৈয়দ শামসুল হকের 'নিষিদ্ধ লোবান' এবং 'নীল দংশন' উপন্যাস দুটিতে। পাকিস্তানী সৈনিকেরা বাঙালীদের মৃত্যুদেহ দাফন না করার ঘোষণা দিয়ে অজস্র মৃতদেহ শেয়াল কুকুরের জন্যে ফেলে রাখে, পশু আর বাঙালী জাতিকে এক প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে। কেননা পশুদের দাফন হয় না। বিলকিস এই অপমানের প্রতিবাদ জানায় অসম্ভব এবং অভাবনীয় এক প্রক্রিয়ায়, প্রতিশোধ নেয় আরো অসম্ভব পদ্ধতিতে' 'মশালের মতো প্রজ্জ্বলিত সমস্ত শরীর দিয়ে।' তেমনি একজন সাধারণ নজরুল ইসলাম পাকিস্তানী বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে স্ত্রী সন্তানের কাছে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল ও শংকিত হয়ে পড়লেও সে মিথ্যে কবি কাজী নজরুল সেজে মুক্তি পেতে চায়না। শেষে অবিরত অমানসিক পীড়নে সে বিদ্রোহ করে নিজের অজান্তেই বৈসরকারী অফিসের এক কেরানী নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম হয়ে যায়। কঠোর কন্টে

Dhaka University Institutional Repository

বলে 'হ্যাঁ আমি কবিতা লিখতে চাই' তবে তোমাদের জন্যে নয়।' সমালোচক আবু হেনা মোস্তফা কামাল যথার্থই লক্ষ্য করেছেন বিলকিস ও নজরুল ইসলাম 'যতটা অতিমাত্রিক হয়ে উঠে ব্যক্তি হিসেবে ততোটা স্বশ্রেণীর সম্প্রসারণ হিসেবে নয়।'

উল্লেখিত উপন্যাস সমূহে ছড়িয়ে আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ, তবে এর কোনটিই মুক্তিযুদ্ধের সময় সম্মিলিত বাঙালির চৈতন্যের জাগরনকে যথাযথ ভাবে অঙ্গীভূত করতে পারেনি। এর কারণ বহুবিধ প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধ-প্রসঙ্গে আমাদের ঔপন্যাসিকদের ধারণা। তাই মুক্তিযুদ্ধের অনুষঙ্গে তাদের উপন্যাস সমূহেও নেই প্রত্যক্ষ উত্তাপের স্পর্শ। অধিকাংশ উপন্যাসই স্মৃতিচারণমূলক, কল্পনানির্ভর কিংবা আবেগ - উচ্ছাসের মনোময় কথকতা। দ্বিতীয়ত, মুক্তিযুদ্ধোত্তর জাতীয় হতাশা আর বিপর্যয় থেকে উজ্জ্বল উত্তরণের দিকে পথ নির্দেশ নয় বরং সর্বব্যাপী হতাশা আর 'নিখিল নাস্তি'র গর্ভে বিলীন হতে চাইলেন আমাদের ঔপন্যাসিকরা এবং এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের অনিঃশেষ অবিনাশী চেতনা খন্ডিত ও বিপথগামী হলো। তৃতীয়ত, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের স্বল্প স্থায়িত্ব এটিকে যথার্থ জনযুদ্ধে পরিণত হতে দেয়নি, ফলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাও হয়নি সর্বব্যাপ্ত এবং এরই শিকার, অধিকাংশ বাঙালির মতো, বাংলাদেশের ঔপন্যাসিকরাও। এ কারণেই একটি স্বাধীন জাতির সুদূরস্পর্শী স্বপ্ন ও পরিকল্পনা শিল্প-সাহিত্যে যথার্থভাবে হলো না রূপায়িত। চতুর্থত, এবং সম্ভবত এটিই প্রধান কারণ, মুক্তিযুদ্ধ এখনো অত্যন্ত কাছের একটি ঘটনা এবং এ-জন্যই অধিকাংশ ঔপন্যাসিকদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আবেগ উচ্ছাস তাড়িত, সেখানে স্বভাবই ফুটে ওঠে শৈল্পিক নিরাসক্তির অভাব। এ প্রমঙ্গে উল্লেখ্য নেপোলীয়নীয় যুদ্ধের (১৮০৪-১৮১৫) অনেক পরেই রচিত হয়েছে লিও তলস্তয়ের কালোত্তীর্ণ মহাকাব্যিক উপন্যাস 'ওয়ার এন্ড পীস' (১৮৬৫-৬৮) গৌবরোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিকতাকে ধারণ করে, রচিত, বাঙালি জাতিসত্তার সম্মিলিত উজ্জীবনের মর্মমূল উৎসারিত, কালজয়ী মহাকাব্যিক উপন্যাসের জন্যে সম্ভবত আরও কিছু কাল অপেক্ষা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচিত গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। 'রাইফেল রোটি আওরাত'-আনোয়ার পাশা (চতুর্থ সং)-সেপ্টেম্বর,১৯৯০ ইং

২। 'জাহান্নাম হইতে বিদায়' - শওকত ওসমান, মুক্তধারা,ঢাকা-১৯৭১

৩। 'নেকড়ে অরন্য'- শওকত দ্বিতীয় প্রকাশ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা-১৩৯৮

৪। 'নিষিদ্ধ লোবান-' সৈয়দ শাসসুল হক, ,অনন্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা-১৯৯০

৫। 'নীল দংশন- সৈয়দ শামসুল ,শ্রেষ্ঠ্য উপন্যাস' বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা-১৯৯০

৬। 'খাঁচায়'- রশীদ হায়দার, (দ্বিতীয় সং) মুক্তিধারা, ঢাকা-১৯৯৭

৭। 'মুক্তিযুদ্ধে উপন্যাস সমগ্র'- আমজাদ হোসেন।

৮। 'হাঙর নদী গ্রেনেড' - সেলিনা হোসেন, দ্বিতীয় সংস্করণ মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৮৪।

৯। 'শ্যামল ছায়া'- হুমায়ুন আহমদ, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

১০। 'আগুনের পরশমনি'- ষষ্ঠ প্রকাশ - ১৯৯৫

১১। '১৯৭১'- আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৯৫

১২। 'সূর্যের দিন' - জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, নবম প্রকাশ, ঢাকা (১৯৮৫)

১৩। 'কেউ জানে না' - মইনুল আহসান সাবের, পল্লব পাবলিকার্স, ঢাকা-১৯৯৪

১৪। 'মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র- ইমদাদুল হক মিলন, অনন্যা , ঢাকা-১৯৯৩

১৫। অপু বিজয় দেখেনি - শিরীন মজিদ প্রথম প্রকাশ - ১৯৯০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। বাংলাদেশের সাহিত্য - বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৯১

২। বাংলা উপন্যাস ঃ সেকাল-একাল-সারোয়ার জাহান, বাংলা একাডেমী।

৩। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সাহিত্য - ডঃ রফিকুল ইসলাম, নতুন প্রকাশ।

৪। স্বাধীনতা উত্তর সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব - আবুল কাশেম ফজলুল হক, /সাহিত্য চিন্তা', বাংলা একাডেমী।

৫। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার উপন্যাস - শাহীদা আখতার, বাংলা একাডেমী।

৬। বাংলাদেশের কবিতা ও উপন্যাস - মুক্তিযুদ্ধের চেতনা - আমিনুর রহমান সুলতান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৭। ঔপন্যাসিক হুমায়ুন আহমেদ এবং 'আগুনের পরশমনি' - সরদার আবদুস সাত্তার, ৮ই ডিসেম্বর' ৯৮ দৈনিক ইত্তেফাক।

৮। 'ইমদাদুল হক মিলনের কথাসাহিত্য' - আহমেদ মওলা, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা।

৯। মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস 'রক্তের অক্ষর' - মাহমুদুল বাসার, ঢাকা বৃহস্পতিবার ১০ মাঘ ১৪০৩, আজকের কাগজ।